জীবনের যাত্রাপথে

শ্রীমতীআশালতা দেবী

শ্রী সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি
১৪।১বি ভুবনমোহন সরকার লেন
কলিকাতা

২৫এ ডিসেম্বর

দাম দেড় টাকা

১৩৪৪ সাল

প্রকাশক—
শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি
রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়
১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মরদার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

তিন

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পরাশরের মন যেন বিতৃষ্ণায় বিকল হইয়া গিয়াছিল। এখানে আর এক দণ্ডও থাকিতে তাহার রুচি নাই...। কেতকীকে কাছে না পাওয়ার ক্ষোভ তাহার যত খানি বেশী না হইয়াছিল, কেতকীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তার মন যেন আঘাতের পর আঘাত খাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জীবনের প্রতি তাহার আর মমতা রহিল না...মানুষ যদিও নিয়তির খেয়ালের খেলনা মাত্র, তবুও সে কি ইচ্ছা করিলে কেতকীকে আপনার করিয়া লইতে পারিত না! আজ কেতকীর দুর্ভাগ্যে বৃথা দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল খরচ করিয়া কোনো লাভই নাই...। কেতকীও তো নিজেকে এই চমৎকার আবেষ্টনীর ভিতরে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে বাহিরে দেখিলে উহার দৈন্যতা কেহ বুঝিতে পারিবে না···কিন্তু অন্তর ··অন্তরের পরিচয় জানে কয় জন? শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌবন যে প্রতি মুহূর্ত্তে আর্ত্তনাদ করিতেছে··· ... ...পরাশর শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতে পারিল না···অসংখ্য চিন্তার কীট তাহাকে যেন কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল। দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ভাঙ্গা মন্দিরে তখনও টিম্ টিম্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে, হয় তো রায় মহাশয়ের যাগযজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই···বন-জঙ্গলের

ভিতরে ক্ষয়প্রাপ্ত সিড়ির উপরে পা ঝুলাইয়া যে আনতমুখী নারীটী বসিয়া আছে, ওইতো কেতকী··· ! গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ী পরিয়াছে সে...চাঁদের ম্লান আলোয় তাকে দেখাইতেছে যেন বিষন্ন বদনা পাষাণময়ী পুত্তলিকা...সর্ব্বনাশ···

পরাশর শিহরিয়া উঠিল, রাত্রির পর রাত্রি কেতকী তাহা হইলে এমনি করিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে...যতক্ষণ না তাহার স্বামীর পূজা শেষ হইবে, ততক্ষণ···তাহার পর পূজান্তে মার প্রসাদী কারণ বারি পান করিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিবে...কেতকী টলিতে টলিতে আসিয়া একাকী শয্যায় আছড়াইয়া পড়িবে... চোখের উপর সমস্ত পৃথিবী তখন ওর টলমল করিয়া দুলিতে থাকিবে...আঃ, টুঃ··· টুঃ...

পরাশর চীৎকার করিয়া উঠিল। কেতকী তার আর্ত্তস্বর শুনিতেও পাইল না, রায় মহাশয় যতক্ষণ না আসিয়া তাহাকে উঠাইবে, ততক্ষণ তাহার উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই ; কেতকী বিহ্বল চোখে শুধু দিঘার কালো জলের দিকে তাকাইয়া ছিল।

কিন্তু কেতকীকে যদি সাপে কামড়ায় ; পরাশর সর্ব্বাঙ্গ ছটফট করিয়া উঠিল। ওই আস শ্যাওড়ার ঝোপ আর ফণীমনসার জঙ্গলের ভিতর কি-না লুকাইয়া নাই ; কোনদিন ওই অবস্থাতেই কেতকীকে দংশন করিবে।···

পরাশর কোঁচাটা গুটাইয়া হাতে করিয়া দালান হইতে নামিল। তাহার পর সহসা কেতকীর সনির্বন্ধ অনুরোধ তার মনে পড়িয়া

গেল। যাইবার সময় কেতকী বার বার করিয়া বলিয়া গিয়াছে; যা কিছু বিসদৃশ দেখ প্রিয়দা, কিছু মনে কোর না...আমার কোন কষ্ট হয় না · ওঁর চোখের দৃষ্টিতেই আমি কেমন হয়ে যাই ·· তাই কিছুই বুঝিতে পারি না··· । কিন্তু রাগলে উনি রক্ষে রাখবেন না, গুনীন মানুষ, অনেক তন্ত্র মন্ত্র জানেন, কি করতে কি করে বসবেন... ।

পরাশর আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর দুইহাতে চোখ ঢাকিয়া সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। সে কাল আর এই স্থানে থাকিবে না। রাত্রি প্রভাত হইলেই পরাশর সটান ষ্টেশনের পথ ধরিবে, আর যাইতে হইলে কেতকীকেও রাখিয়া যাইবে না···কেতকী যদি স্বেচ্ছায় যাইতে না চাহে, তাহা হইলে উহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, চোখে দেখিয়া পরাশর উহাকে এমন করিয়া মরিতে দিতে পারে না।

প্রদীপের তেল ফুরাইয়া গিয়াছিল...কতক্ষণ পরে আলোটা একবার জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। ঘর ভরিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে···জানালার নীচেই ফুলের বাগান, একটা উগ্রজাতীয় ফুলের গন্ধে পরাশরের সর্ব্ব শরীর যেন ঝিম ঝিম্ করিতে লাগিল...কতক্ষণ পরে সে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

··· ··· ···

শেষ রাত্রে—চাঁদের আলো তখন জানালা হইতে সরিয়া গিয়াছে,

পরাশরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল কে যেন তার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে হাত পাখাখানি নাড়িয়া তাহাকে হাওয়া করিতেছে···পরাশরের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল...কে এ··· পরাশর অনুভব করিতেছিল কাহার স্থূল উপস্থিতি...নিশ্বাস প্রশ্বাসের চাপা ভারী শব্দও শুনিতে পাইল...কিন্তু সে চোখ মেলিয়া চাহিল না···পাছে তাহার এই সত্য হউক মিথ্যা হউক সুমধুর অনুভূতিটুকু রূঢ় বাস্তবের ছোঁয়ায় ভাঙ্গিয়া যায়। পরাশর নিমীলিত চোখে পড়িয়া রহিল।

···　　　　···　　　　··　　　　···

পরাশরের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সকালের প্রসন্ন সূর্য্যালোকে ঘর ভরিয়া গিয়াছে; উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভাঙ্গা মন্দিরটা তাহার চোখে পড়িল...দেবতার পূজার নামে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার সর্ব্ব অন্তঃকরণ বিরূপ হইয়া উঠিল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই পরাশর দেখিল রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া কেতকী পুষ্পপাত্র হইতে ফুল বাছিয়া বাছিয়া ঝকঝকে তামার টাটে তুলিয়া রাখিতেছে···পদ শব্দে কেতকা মুখ ফিরাইল। পরাশরকে দেখিয়া সে প্রসন্ন গলায় কহিল, এই যে প্রিয়দা, ঘুম ভাঙলো এতক্ষণে ?

পরাশর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেতকীর ম্লান-স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিল। কেতকীর দুইটি চক্ষুর নীচে কাজলের রেখার মত ঘন কালীর দাগ পড়িয়াছে. মুখখানি বাসী ফুলের মত ম্লান···কিন্তু ওর পাতলা

দুইখানি ওষ্ঠাধর হাসির আমেজে ভরা...পরাশর বিস্মিত হইল, কেতকী কেন কাঁদে না···কেতকী যদি একটু মন খুলিয়া কাঁদিত তাহা হইলে পরাশর বোধ হয় একটু আরাম পাইত ...যেমন সব মেয়েরাই কাঁদে···! কিন্তু ওই মেয়েটিকে বুঝিবার উপায় নাই, নিজেকে ও যেন রহস্যের সূক্ষ্ম আবরণে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।...

পরাশর অদূরে বসিয়া পড়িল, তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল, আমার ঘুম তবু হয়েছে টুনু, কিন্তু তুমি তো সারারাত্রি ঘুমোও-নি ?

কেতকী চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর বিস্ফারিত চোখে কহিল, কে বল্লে ?

পরাশর সংশয় বিদ্ধস্বরে কহিল, বলবে আবার কে, আমি জানি ! টুনু, একটা কথা বলি, শোনো—এমনি করে যারা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে তাদের কি শাস্তি দেওয়া উচিত জানো ?

কেতকী উর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিল, কী ?

পরাশর শান্ত 'নির্বিকার কণ্ঠে কহিল, তাদের ধরে চাবুক মারা, অথবা জেলে পুরে দেওয়া, ও কি টুনু, শিউরে উঠলে যে ?

কেতকী রুদ্ধ গলায় বলিয়া উঠিল, কী বলছ প্রিয়দ', তুমি কি ওঁকে জেলে দেবে না কি !

পরাশর হাসিমুখে কহিল, ইচ্ছে তো করে···কিন্তু দেব না···

কারণ আমি হাঙ্গামা জিনিষটা মোটেই পছন্দ করি না…তার চেয়ে—

বলিয়া পরাশর এক মুহূর্ত্ত থামিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, তার চেয়ে তুমিই এখান থেকে চল না টুনু…এমন স্বামীর ঘর নাই বা করলে?

কেতকী পরাশরের মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তোমার কথা আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না প্রিয়দা? কি বলছো তুমি…কেন আমাকে এ সব প্রলোভন দেখাচ্ছ…কী মতলবে তুমি এখানে এসেছ…?

পরাশর স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, মতলব আমার কিছুই ছিল না টুনু…তোমার কাকার মুখে খবর শুনে তোমাকে একবার দেখবার সাধ হয়েছিল, তাই এসেছিলুম…কিন্তু জানতুম না যে সেই টুনু আমাদের তিল তিল করে মরণের রস অঞ্জলীভরে পান ক'রে চলেছে। রাগ করো না টুনু, তোমরা ভাব, এই করে তোমরা পুণ্যের থলে বোঝাই করবে…কিন্তু এ যে কত বড় মহাপাপ…

কেতকী সহসা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, তুমি থাম প্রিয়দা, ওসব আমি জানি…নতুন করে শেখাচ্ছ কি…। এখানে থাকতে তোমার না ইচ্ছে যায় তো তুমি চলে যাও, দোহাই তোমার, তুমি তো জানো, এ ছাড়া আমার কোনো আশ্রয় নেই…

কেতকীর দুই চোখের কোল বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। পরাশর ব্যথিত গলায় কহিল, কাঁদছো কেন

টুকু...এতে কাঁদবার কথা কী আছে? ভেবে দেখ···এমনি করে দিনের পর দিন তুমি শুধু এক তান্ত্রিকের হাতের খেলার পুতুল হয়ে থাকবে? তোমার কি সাধ নেই···আকাঙ্ক্ষা নেই···? জীবনে যা সবচেয়ে বড় কামনা—

কেতকী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, প্রিয়দা···দয়া করে তুমি এখন এখান থেকে উঠে যাও···আমার কাজে বড় ভুল হচ্ছে···। দেখছো তো কত বেলা হয়েছে পূজোর সময় হয়ে এল···খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হও; তখন গল্প করবো'খন...

পরাশর মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল...কেতকী আঁচলে মুখ মুছিয়া ফুলের সাজিটী হাতে লইয়া মন্থর পায়ে দালান হইতে নামিয়া বাগানের সরু পথটী ধরিয়া মন্দিরের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

চার

কেতকী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পরাশর ঘরে বসিয়া স্যুটকেশে তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে···কেতকীকে দেখিয়াও পরাশর মুখ ফিরাইল না, কেতকী সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সবের মানে কি প্রিয়দা ?

পরাশর নিম্ন গলায় কহিল, দেখে তো বুঝতে পাচ্ছ টুনু, মিথ্যে প্রশ্ন করা

কেতকী কহিল, তাহ'লে তুমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছ প্রিয়দা··· দু'টী খেয়ে যাবে না ?

—না টুনু, প্রবৃত্তি নেই আর···তুমি তো বেশ সুখেই আছ দেখছি···মিথ্যে আমি মনগড়া কল্পনায় কষ্ট পাচ্ছিলুম···। আসি তাহ'লে টুনু···?

কেতকী দরজার কপাটে একখানি হাত রাখিয়া ম্লান গলায় কহিল, কিন্তু, এখন তো কোনো ট্রেন নেই যাবার।

ট্রেণ না থাক টুনু, ষ্টেশন তো আছে।

বলিয়া পরাশর মুখ তুলিয়া হাসিতে গেল! কিন্তু কেতকীর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে হাসি তাহার ওষ্ঠেই মিলাইয়া গেল, কেতকীর মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই, মৃত চাঁদের মত পাণ্ডুর··· কেতকীর মনের সহিত পরিচয় ঘটিল পরাশরের এইবার নূতন করিয়া।

পরাশর নতশিরে চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কেতকী না করিল বিদায় সম্ভাষণ, না ফেলিল চোখের জল, এতটুকু নড়িতে পর্য্যন্ত দেখা গেল না। তার দেহে যেন প্রাণ নাই, পাষাণময়ী পুত্তলিকা!

পরাশর ভাবিল কেতকী হৃদয়হীনা···কেতকী মানুষের হৃদয়ের বিচার করে না।

··· ··· ···

আবার সেই পথ, আবার সেই যন্ত্র যান···

পরাশর জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল! যে মন লইয়া সে আসিয়াছিল, সে মন লইয়া ফিরিতে পারিল না। ট্রেণ চলে হু হু করিয়া, টেলিগ্রাফের তারে বসিয়া যে বেগুনী রঙের ছোট ছোট পাখীগুলি দোল খাইতেছে। কচুরীপানায় আচ্ছন্ন পুকুর পাড়ে বাসনের গোছা নামাইয়া বাংলার বধূরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে সচল গাড়ীখানির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, এমনিতর ছোটোখাট জীবন্ত চিত্রের দিকে পরাশরের চিত্ত আর ঝুঁকিয়া পড়িল না। পরাশর মেয়ে হইলে খানিকটা কাঁদিয়াও মনের ভার লঘু করিতে পারিত।

কিন্তু ও নাকি পুরুষ···সহস্র বেদনাতেও ওর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইবে না। পরাশর নীল নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, এত স্বচ্ছ, এত প্রশান্ত আকাশ, ইহার বুকেও আছে বজ্র, আর আছে দুরন্ত দৈত্যের মত কালো মেঘ···

এই কয়টা বৎসর পরে পরাশর কেতকীকে কি দেখিতে আসিয়া-ছিল ? পরাশর তো জানিতই কেতকীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেতকী এখন তাহার মর্ত্ত্যলোকের মূর্ত্তি নহে, অমর্ত্ত্যের স্বপ্ন···

আষাঢ়ের বর্ষণ-মুখর রাত্রে···আকাশের কোলে ঘনাইয়া উঠে যে মায়া, কেতকী সেই মায়া···দিবারাত্রির আলো-ছায়ার মায়া, স্বপ্নের কুহেলী···তবুও পরাশরের অবোধ মন কেন যে বুঝিল না। কেতকীতো শুধু নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে নিজের নারীত্বকে তিলে তিলে হত্যা করিতেছে, তার দেহ মন, অফুরন্ত যৌবন···ক্ষুধিত আত্মা তৃষ্ণায় কাতর, কেতকী তাহাদের কি দিয়া পরিতৃপ্ত করিবে ! বুভুক্ষু আত্মার ক্ষুধা মিটাইবে কি দিয়া ?···

সেই সে দিনের চেনা-ঘরের ঘর-পোষা মেয়ে কেতকী···আজ তান্ত্রিকের তন্ত্র সাধনার সহায়তা করে···দেবতার প্রসাদ বলিয়া অম্লানমুখে পান করে কারণবারি···। মেয়েদের এত বড় অধঃপতনের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে পরাশর আর শুনিয়াছে কি !

পাঁচ

মন টানিতেছে এইবার ঘরের পানে···মায়ের টানে, মাটীব টানে মন টানিয়াছে তাই পরাশর আর অন্য কোথাও নামিল না, ফিরিয়া চলিল মায়ের কাছে। মার স্নেহ-স্নিগ্ধ বুকখানির নীচে মাথা রাখিয়া সে একটু বিশ্রাম পাইতে চাহে। তার মনও ক্লান্ত, দেহও ক্লান্ত···বহুদিন পরে পরাশরকে কাছে পাইয়া মা ছুটিয়া আসিলেন।

পুত্রকে বুকে জড়াইয়া মা যেন সমস্ত স্বর্গটাকেই মুঠার ভিতরে পাইলেন। সারাদিন পরাশরও মায়ের কাছে কাছে রহিল, তাহার মন যেন অকস্মাৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যার পর মা ছাদের উপর শীতলপাটী বিছাইয়া বসিলেন... পরাশরকে ডাকিতে হইল না, পরাশর নিজেই উঠিয়া আসিল, আকাশে কালো কালো মেঘের আড়ালে মাঝে মাঝে বাঁকা-চাঁদের লুকোচুরি...গত রাত্রির কথা পরাশরের মনে পড়িল, এবং তারও আগের রাত্রির...পরাশর যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। মায়ের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া সে অস্পষ্ট গলায় কহিল, মা, টুনুকে তোমার মনে আছে?

মা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কে বল তো, তোর রেবতী

কাকার মেয়ে টুনু তো? পরাশর বদ্ধ গলায় কহিল, হঁ্যা সেই-ই।

কোথায় আছেরে টুনু...তোর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে প্রিয়? কেমনটী দেখলি তাকে, ভাল আছে তো?

পরাশর একটু হাসিল:—হ্যাঁমা, দেখা হয়েছে তার সঙ্গে, কিন্তু তাকে ওভাবে না দেখলেই ভাল হ'ত...!

পরাশরের কণ্ঠের স্বরে ক্ষোভ ও বেদনা যেন একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। মা ব্যথিত গলায় কহিলেন, শুনেছিলুম বটে বুড়ো বর, কিন্তু পয়সা না কি অগাধ···বিষয় আশয় যথেষ্ট আছে···

পরাশর শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত গলায় কহিল, হঁ্যা, তা থাকতে পারে, কিন্তু তিনিতো শুধু বুড়োবরটীই নন, তিনি শক্তির উপাসক, তিনি একজন ঘোরতর তান্ত্রিক, মোট কথা, টুনু বেশীদিন আর বাঁচবে না···

মা শিহরিয়া উঠিলেন! বলিস কি প্রিয়, টুনুর অবস্থা এত খারাপ দেখলি? পরাশর আবার অলসভাবে খাটীর উপর শুইয়া পড়িল! সে তুমি বুঝবে না, মা, তোমাকে বোঝাতে পারবো না!...তবে ওই রকম তান্ত্রিকের সহচরী হ'য়ে টুনু কতদিন বাঁচতে পারে? অসম্ভব...টুনুকে আমরাই মেরে ফেল্লাম, মা··· তুমি যদি তাকে দেখতে—

পরাশর অস্থিরভাবে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরাশর মা'র কাছে যত সহজে ধরা দিল, কিন্তু গম্ভীর-প্রকৃতি

রাশভারি পিতার নিকট হইতে তেমনই দূরে দূরে রহিল। পিতাকে দেখিলে ওর যেন ভয় করে, কারণ কেতকীর এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তো...

পদচারণা করিতে করিতে এক সময় ক্লান্তি আসে, মা কখন উঠিয়া গিয়াছেন...বৃহৎ পরিজনের কর্ত্রী তিনি...সমস্ত দিকে তাঁহার না দেখিলে চলে না...

পরাশর ছাদের আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে...

সকালবেলা...। পরাশরের ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলাই হয়।... কারুকার্য্যহীন ছোট পালিশ করা খাটখানিতে তখনও নেটের মশারীটা টাঙ্গানানোই থাকে...ভোরের শিশু আলো, নরম আলো সে আবরণ ভেদ করিয়া পরাশরের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে না... পরাশর তখনও বুঝি স্বপ্ন দেখে...

প্রথম জীবনের সেই দিবসগুলি...যখন পৃথিবীর একটা দিকের সহিতই তাহারা পরিচিত হইয়াছিল...ঘনিষ্ঠতা যখন তিল তিল করিয়া অনুরাগে নব জন্ম লাভ করিতেছে, যখন বিশেষ একটী মেয়েকে ভালবাসাই ছিল জীবনের ধর্ম্ম...দুঃখ ও বেদনায় ভরা পৃথিবী যখন ছিল স্বর্গ...তখন পরাশর ও কেতকীর কেহই এই পৃথিবীর অপর দিকটা চাহিয়া দেখে নাই...কিন্তু প্রথম সে পৃথিবীকে চিনিল, যখন কেতকীর সহিত বিবাহ লইয়া একটা অসন্তোষের সূচনা হইল...

কেতকী তো তাহারই হইত···নাই বা কোষ্ঠির বিচার হইত; তাহাতে আর উহাদের কতটুকুই বা ক্ষতি হইত···

চরম ক্ষতি আজ যাহা কেতকীর সে সচক্ষে দেখিয়া আসিল··· হাসি পাইয়াছিল পরাশরের...রায় মহাশয়ের সহিত কেতকীর নাকি রাজযোটক মিল হইয়াছিল...

হ্যাঁ···রাজযোটকই সত্য···

পরাশর যখন উঠিল, তখন বেলা সাড়ে নয়টার কাছাকাছি একটা সময়। পরাশর একটু লজ্জিত হইল··। শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া সে চারিদিকে একটু নূতন দৃষ্টিতে চাহিল···এই পরিচিত ঘরখানি সে কতদিন হইল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল···জন্মিয়া অবধি সে এই ঘরখানিতেই মানুষ হইয়াছে··· বড় হইয়া, তাহার নিরালা নির্জ্জন গৃহের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সেই ঘরখানিই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল···ঘরের মেঝে হইতে সীলিং পর্য্যন্ত যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে···ছবির কাঁচগুলি ধূলি-মলিন নহে...তাহার বইএর দুইটা আলমারী ও র‍্যাক্‌ পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন···

মা'র কাজ ইহা...নিশ্চয়ই, মা ছাড়া পরাশরের উপর এত দরদ এ বাড়ীতে কাহারই বা আছে পরাশরের মনের কোণে বেদনার ছোঁয়া লাগিল ..মা'র জন্য তার অন্তর সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।...না মার তো কোন দোষ নাই···মা চিরদিনই ধরিত্রীর মত সহনশীলা...নয় বৎসরের বালিকা বয়স হইতে আজ

পর্য্যন্ত তিনি মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে কোন অভিযোগ করেন নি।···সেকালের মেয়েরা সকলেই বুঝি এমনি করিয়া শুধু সহিয়াই যাইতেন···অভিযোগ বা অনুযোগ করাটাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন···

ছয়

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পরাশর বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া পড়িল। নীচে দাসদাসী…আত্মীয়-আত্মীয়া সমাবৃত বৃহৎ উঠান…রান্নাঘরের দ্বারের সুমুখে চওড়া দালানের উপর সারি সারি বঁটি পাতিয়া কাকীমা জ্যেঠিমার দল আনাজের ছোট বড় ধামা ও চুপড়ী লইয়া বসিয়া গিয়াছেন…ছোট ছোট মেয়েরাও বসিয়া নাই, কেহ শাক বাছিতেছে, কেহ সুপারী কুঁচাইতেছে… আর তাহার মা, জগন্মাতা দশভূজার মত অধরে স্নিগ্ধ হাসিটুকু লইয়া চারিদিকের কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতেছেন…

এই মা, এই মায়ের সন্তান পরাশর, এই স্নেহময়ী মা'র বক্ষঃস্থল ছাড়িয়া সে দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।…

পরাশরকে নীচে নামিতে দেখিয়া সেজ কাকীমা দরদভরা কণ্ঠে কহিলেন, কিছু না খেয়ে শুধু মুখে যেন বেরিও না বাবা, খালিপেটে পিত্তি পড়বে…

সেজকাকীমার সুরে সুর মিলাইয়া সকলের কণ্ঠ হইতেই যেন দরদমাখা সুর ঝরিয়া উঠিল ; মা গো প্রিয়'র চেহারা কি ছিল আর কি হয়েছে·· চেনা যায় না আর…সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই…হবে না…বাছারে…

পরাশর বিব্রত হইয়া ডাকিল, মা…

মাকে দেখিয়া পরাশর যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পরাশর কহিল, শুধু এক কাপ চা আর দু'খানি বিস্কুট···আর কিচ্ছু খাব না মা,...আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও···আমি স্নান করেই যাচ্ছি···

বলিয়া পরাশর উঠান পার হইয়া স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাঙা কাকীমা ধীরে ধীরে কহিলেন, ও সব বয়সের দোষ দিদি···এত বড় সোমত্ত ছেলে, ঘরে এল না একটা টুকটুকে বউ... মন কি আর ওতে ভাল থাকে?

সেজ কাকীমা একটা প্রকাণ্ড কুমড়াকে দুইফালি করিয়া রাঙা কাকীমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, বিয়েত' হতই···কোনখানটার আর বাকী ছিল বল না···তত্ত্ব-তাবাস দেওয়া নেওয়া···সবই···এমন কি—সেই টুনুকে জানিস তো?

পরাশরের কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল···। কেন, কেন উহারা টুনুর নাম লয়, কেতকীকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন···

প্রয়োজন কিছুই নহে, শুধু কৌতূহল মেটানো···

একটা কুৎসার আবর্ত সৃষ্টি করা···

টুনু...আর টুনু···কতই না ইহারা টুনুর দরদী বন্ধু··· বিকচোন্মুখ ক্রমবর্দ্ধমান কুঁড়টী অকালে শুষ্ক শীর্ণ হইয়া মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে · সে তো ইহাদেরই মত শ্রীচণ্ড মত বাদীদের প্ররোচনায়...

জীবনের যাত্রাপথে

অন্যমনস্কের মত পথ চলিতে চলিতে পরাশর ভাবিল জীবনের যাত্রাপথের এই তো হল সুরু...কোথায় ইহার শেষ...কত বেদনার সাগর ডিঙ্গাইয়া, পাষাণের বুক চিরিয়া তাহাকে পথ করিয়া লইতে হইবে... খুঁজিয়া লইতে হইবে নূতন পথ, নূতন মানুষ...বহু শতাব্দীর লাঞ্ছিত পৃথিবীর বুক মন্থন করিয়া তাহাকে আনিতে হইবে অমৃত...

হ্যারিসন রোডের মোড়ের উপর বাস ষ্টপেজের কাছে দাঁড়াইয়া ও কে...সুপ্রিয় নয়? পরাশর দ্রুতপায়ে গিয়া তাহার কাছাকাছি দাঁড়াইল...সুপ্রিয়ই তো কিন্তু সুপ্রিয়কে দেখিলে চেনা যায় না, শীর্ণ দেহ · মলিন মুখশ্রী, তাহার উপর তাহার পরিচ্ছদও খুব পরিস্কার নহে...

এক নিমেষে পরাশর অতীতের সুব্রতর দিকে ফিরিয়া চাহিল, মার্জ্জিত রুচি পরিচ্ছন্ন বেশবাস...অতিরিক্ত রঙ্গপ্রিয় সুব্রত... যাহার চকচকে পালিশ করা জুতার ডগায় ও কোঁচানো শান্তিপুরের কালাপাড় ধুতিতে কেহ কোনদিন এতটুকুও ময়লা আবিষ্কার করিতে পারে নাই...সেই সুব্রত...

পরাশরকে দেখিয়া সুব্রত প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তাহার এই দৈন্যতা যেন আজ তাহাকে বড় বেশী মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত করিয়া তুলিল।...

নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া সুব্রত শুষ্কমুখে সম্ভাষণ করিল; অনেকদিন পরে দেখা, ভাল আছ তো?

পরাশর স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তা আছি, তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় ?

সুব্রত ক্ষীণ হাসিতে শুষ্ক ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া কহিল, আর কোথায়, মহাতীর্থে... যে মহাতীর্থে আমাদের মত অভাগারা খেয়ে না খেয়ে হাজিরা দিতে ছোটে দল বেঁধে···জীবনের সেই সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে বড় কামনার তীর্থের উদ্দেশ্যে...। বিকেলে যদি সময় পাও তো যেও আমার ওখানে...নং স্যারপুলী লেনে···আচ্ছা···

চোখের সুমুখ দিয়া প্রকাণ্ড বাসখানা যাত্রী বোঝাই হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।...

কামনার মহাতীর্থ...বি, এ পড়িতে পড়িতে কি সুব্রত কোন-দিন কামনা করিয়াছিল যে সে ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য একদিন লালায়িত হইবে...! এ কামনা তাহার জাগিল কবে কোনদিন হইতে···এই কামনার মহা সাগরের জলে সুব্রত কবে কোন শুভক্ষণে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছে ; এই কি তাহার স্বপ্ন দেখার ফল···সুব্রত না বলিত, সে বড় হইবে, মানুষের মত মানুষ হইবে, পাশ করিয়া সে ডিগ্রীগুলি লইতেছে কেবল বিদ্যার্জ্জনের হেতু···নতুবা···

আচার্য্য পি, সি রায় কিম্বা...আরও কোন মহাত্মাদের পথানু-বর্ত্তী হইয়া চলিবে, দেশের বুক হইতে দরিদ্র অসহায়ের সংখ্যা ঘুচিয়া যাইবে। ছোট নীচ কুলী জাতীয়রাও মানুষ বলিয়া পরিচয়

দিতে পারিবে…সে কাজ করিবে, কাজ অফুরন্ত উদ্দাম মনন শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে…

তাহার পর, তাহার পর সে তাহার নব লব্ধা মানসীকে লইয়া পাড়ি দিবে ইউরোপে…সঙ্গে থাকিবে তাহার ছোট বোন কাজলী…

সেই স্বপ্ন, সেই কামনার তীর্থ কি সুব্রত খুঁজিয়া পাইয়াছে, এতদিনে কি মিলিয়াছে সেই বাসনার কল্পতরুর সন্ধান…

সাত

পৃথিবী ও সংসারের এই নগ্ন রূপ দেখিয়া পরাশরের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। কোথায় গেল তাহার কল্পনার তরঙ্গায়িত লীলা বিলাস…কোথায় গেল তাহার অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ সৌখীন মন। চিরকাল সুখের অন্নে পরিপুষ্ট, দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে কোনদিনই তাহাদের পরিচয় ঘটে নাই…দারিদ্র্যের মূর্ত্তিমান দৈত্যের সহিত ভাগ্যক্রমে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইবার সম্ভাবনাও ছিল না কোনো কালে…অর্থের যে এত সমাদর, এত মূল্য সংসারের তাহা জানে না…

কিন্তু আজ যেন সে চিনিতেছে অল্প অল্প করিয়া জগৎটা কে …দুঃখ কষ্ট ক্লেদ গ্লানি ভরা জগতের সহিতই পৃথিবীর মানুষের পরিচয়টা যে সবচেয়ে বেশী…পরাশর যেন বুঝিতেছে…

মাসীমা যে তার দারিদ্র্য পীড়িত অসহায় সন্তানদের জন্য নিরুদ্ধ বেদনায় মাথা কুটিয়া মরিতেছে, পৃথিবীর রোমে রোমে সেই ক্রন্দনের সুর উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে, দিকে দিকে আজ তাই হাহাকারের ধ্বনি, বেদনার বিলাপ গাথা…পরাশরের ভাবপ্রবণ মন মমতায় কারুণ্যে ভরিয়া উঠিল…

কয়টা বৎসর সে বৃথা অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, আর নহে, আর সে স্বপ্নের পিছু পিছু ছুটিবে না।

রাসবেহারী আভেন্যুর নির্জ্জন প্রশস্ত পথ…পরাশর আশ্চর্য্য হইয়া গেল; উমাকেও সে ভোলে নাই…নহিলে এতখানি পথ আসিল সে কি করিতে…

সেই বাড়ী…সেই সুন্দর কেয়ারী করা তৃণপথ, ফুলের বাগান, চন্দ্রমল্লিকার সেই সুপরিচিত সুমিষ্ট গন্ধটুকু…

পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজও পরিচিত মনে হইতেছে,…বেশ মিষ্ট লাগিতেছে…এ আর কাহারও হাত নহে, উমা, উমা বাজাইতেছে আপনার খুসীর খেয়ালে…

তার নরম আঙুলগুলি রীডের উপর লঘু চঞ্চল ভাবে বুলাইয়া মৃদু সুরে সে হয় তো কোনও ইংরাজী গানের কলিই আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে…উমা পিয়ানো বাজায় সুন্দর, ওর হাতের মিষ্টি বাজনায় ঘুম পাড়াইয়া দেয়; ওর গলাও বড় মিষ্ট…সুইট উমা…

কিন্তু উমা অত্যন্ত সহজ…অতিরিক্ত স্পষ্ট…পরাশর জানে উমা কাহাকেও ভালবাসে না; কোনও দিন উমার মত মেয়ে ভালবাসিতে পারিবেও না…তবুও উমাকে সে মাঝে মাঝে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারে না…

… …

কার্ড পাঠাইতে হইল না, পর্দ্দা সরাইয়া পরাশর নিজেই গিয়া ঘরে ঢুকিল, পিছন দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল উমা.. পরাশরকে দেখিতে পায় নাই…সিক্ত চুলের রাশি ওর পিঠ বাহিয়া সাপের মত লুটাইতেছে…চমৎকার গন্ধ…হয়তো ওর

চুলেরই···উমার পিঠের উপর হইতে আঁচলখানিও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে···

উমা তো জানে না, যে এমন অসময়ে তাহার ঘরে কেহ আসিবে! পরাশর, খামখেয়ালী পরাশরের স্মৃতি কুয়াসার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিবে, উমা আপন মনেই হাসে কী অদ্ভুত ছেলে, একটি মেয়েকে ভাল বাসিয়া পাইল না, সেই ক্ষোভে দেশত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে···।

দুইটী হাত পিয়ানোর উপর নাচিয়া বেড়াইতেছে...উমা যেন সুরের ঝড় বহাইয়া দিয়াছে, কলোচ্ছ্বাসে জাগিয়াছ যেন বন্যা...

উমা···

উমা পিছন ফিরিয়া বিস্মিত গলায় কহিল. আরে তুমি! ভারি চমৎকার ছেলে তো তুমি···এস, এস...

পরাশর ঘরে ঢুকিল, যেন কতকটা অপরাধীর মতই, মুখে চোখে লজ্জার ঈষৎ ছায়া পড়িয়াছে...লজ্জা ও সঙ্কোচ মেশানো ছায়া...

উমা ছেলেমানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন বর্ষার নদী কুলু কুলু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে...

বেড়ানোর মোহ ভাঙ্গল পরাশর? এতদিন পরে মনে পড়লো ঘর কে...? উমার কথায় পরাশর ম্লান হাসি হাসিল। তাই! ঘর ভুলে থাকতে পারলাম কই, তোমরা কি আমায় থাকতে দিলে উমা?

পরাশর চেষ্টা করিয়াও তাহার কণ্ঠের করুণ সুরকে লুকাইতে পারিল না···উমা দেখিল পরাশর মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে···উমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে কিন্তু কিছুই এড়াইয়া গেল না, উমা কেতকী ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই অবগত ছিল।

ঈষৎ রহস্যচ্ছলে উমা কহিল, পুরী গিয়েছিলে না, টুনুর দেখা পেলে?

পরাশর এইবার ঘুরিয়া বসিল, পরাশরের চোখের দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিয়াছে। টুনুর নামে···টুনুকে সে ইচ্ছা করিয়াই ভুলিতে চাহে না···

পরাশর উমার পিয়ানোর উপর ইংরাজী গানের বহিখানি তুলিয়া লইয়া চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে কহিল; পৃথিবীতে কত রকম মেয়ে আছে উমা, জানো?

উমা বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল; তার মানে?

পরাশর কথাটা বলিয়া ফেলিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, উমার কাছে কেতকীর জীবনের দুর্গতির কাহিনী বলিয়া লাভ কি? কেতকীর বেদনায় তাহারই অন্তর মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই বলিয়া···

পরাশর নিজেকে সম্বরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, তার মানে আর কিছুই নয়, এমনিই জিগ্যেস কর্চ্ছিলুম। হ্যাঁ, টুনুর কথা বলছ··· টুনুকে দেখে এলুম, দিব্যি সে সংসার করছে, রাশভারি কর্ত্তাটিও তরুণী ভার্য্যার হস্তগত প্রায় হয়ে রয়েছেন, কোনও দুঃখ নেই,

অভাব অভিযোগ নেই, মনের আনন্দে সে জন্মের ঋণ পরিশোধ করে চলেছে···মানে, এই মেয়ে হয়ে জন্মালে তো ঋণ পরিশোধ করতে হবে এইভাবে,···কি বল উমা ?

উমা পিয়ানোর চাবিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিল, তোমার কথার সুরটা বেসুর লাগচে পরাশর, ও সব হেঁয়ালী ভরা কথা আমি বুঝি না, মোটের ওপর টুনুকে দেখে এসেচ একটি সুখী পরিবারের গৃহিণী···পিঠের উপর চাবীর গোছা ঝুলিয়ে খুব সহজভাবে গিন্নি-পনা করছে, তাহলে তোমার তো কোন দুঃখই থাকতে পারে না, কি বল পরাশর ?

আলস্যবশতঃ একটা হাই তুলিয়া পরাশর কহিল, না··· আমার আর কোন দুঃখ নেই, তারপর তোমার কি খবর বল ? বিয়ের বাঁশী কি এবার বাজবে না কি ?

দুইটী চোখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া উমা সাশ্চর্য্যে কহিল, বিয়ের বাঁশী বাজবে কার, আমার ? তুমি কি পাগল হয়েছ পরাশর, বিয়ে করব কাকে ? মানুষ আছে কেউ ? সব নির্জ্জীব অসার···স্বাবকতা জানে, জানে শুধু কথার ফুলে নানা ছাঁদে মালা গাঁথতে ! কিন্তু দয়িত হতে গেলেই যে দায়িত্ব নিতে হয় সেটা তারা ভুলে যায়, যাক, কি সব বাজে বকচি, মাকে ডেকে আনি, বোস···চা টাও একটু আনি,—

পরাশর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দুইটি হাত যুক্ত করিয়া অনুনয়ের ভঙ্গীতে কহিল, মাপ কর উমা,

তুমি তো জানো, বার বার খাওয়া আমার অভ্যাস নেই, আমি শুধু এসেছিলুম তোমাদের দেখতে, অনেকদিন দেখিনি…। ফিরেচি কাল, অনেক দেশই বেড়ালাম, অনেক কিছুই দেখলাম, কিন্তু উমা, মনের ভেতর একটা পাথরের মত ভার চেপে যে বসেচে সে ভারকে কোথাও নামাতে পার্চ্ছি না…এত ঘুরেও মনকে হালকা করতে পারলাম কই ?

কথা কহিতে কহিতে পরাশরের মন যেন কার বঞ্চিত জীবনের অতল তলায় নিশ্চিহ্ন ভাবে ডুবিয়া গেল, অসহায় মানুষের হৃদয় লইয়া দেবতার এ কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন খেলা।…

আট

সন্ধ্যার একটু আগে পরাশর বাহির হইল আরপুলী লেনের উদ্দেশ্যে···সুব্রত তাহার অনেকদিনের বন্ধু, সুব্রতর আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিবে না···

কাল সে উমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোথাও বাহির হইবার সময় পায় নাই, তাহারই বাড়ীতে অনেকগুলি বন্ধু সমাগম হইয়াছিল। কেহ কবি, কেহ সাহিত্যিক, কেহবা দার্শনিক আবার কেহবা নিতান্তই নিরীহ চাকুরীজীবি বা প্রফেসার গোছের এমনিই···

কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া উঠে, পরাশর বহুদিনের অতীতকে যেন খুঁজিয়া ফিরিয়া পায়, সেই গল্প সেই হাসি গান, নীরেশের কাব্য রচনা, বিজনের ব্যাঞ্জোর ঝঙ্কার...পরাশর দুঃখ বেদনা ভুলিয়া গিয়া প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়াছিল। দীন দুঃখী সুব্রতর কথা পরাশরের বুঝি মনেই পড়ে নাই···অন্তরের সমস্ত স্থানটী জুড়িয়া যাহার স্মৃতি অনির্ব্বাণ অমলিন হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে, বুঝি সে বিস্মৃত হইয়াছিল তাহাকেও।

সেই টুনুকেও তাহার মনে ছিল না...

সহরের এই দিকটায় আসিতে পরাশর পারতপক্ষে রাজী হয় না···এত ঘিঞ্জি আর সরু গলিঘুঁজি...পরাশরের যেন দম বন্ধ হইয়া যায়...। সহরের এ দিকে আলোও জলে, দোকানে দোকানে হয় তো রেডিওতে গানও শোনা যায়, কিন্তু তবু যেন এ ধারের

দৈন্যতাটুকু এ সকল ছাপাইয়া লোক চক্ষে ধরা পড়ে, দুই একটা খোলার ঘরের বস্তীর সুমুখটাও নজরে পড়ে, তাহাদেরও বীভৎস দৈন্যতা লুকাইবার অপরূপ রূপসজ্জা দেখিয়া হাসি পায় না···বেদনায় কারুণ্যে অন্তর ভরিয়া উঠে,—

রূপসী না হইয়াও তাহাদের রূপবতী হইবার প্রচেষ্টা দেখিয়া সত্যই মায়া হয়...

ছোট একটা একতলা বাড়ীর সুমুখে আসিয়া পরাশর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, গলির সুমুখ দিয়া ময়লা জল নিষ্কাশনের পথ·· জায়গাটা ঠিক আরপুলী লেন্ নহে, ও পাশে একটা ডাষ্টবিন বসানো, দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া যায়, সুব্রত বাছিয়া বাছিয়া ইহার ভিতর হইতে কি রকম বাসগৃহ আবিষ্কার করিয়াছে কে জানে, সেই সুব্রত···

··· ··· ···

ছাদের এক ধার হইতে প্রচুর ধূম বাহির হইয়া উর্দ্ধে···শূন্যে মহাকাশে মিলাইয়া যাইতেছে···যে আকাশের এক টুক্‌রা দেখিতে পাইলে সুব্রতরা বোধ হয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়···

দরজাটা ভেজানোই ছিল, ঠেলিতে গিয়া বেশ্রী একটা শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল···ছোট উঠানের এক ধারে কলের নীচে কুঁজা পাতিয়া কাজলী বুঝি জল লইতেছে, পিঠের উপর রুক্ষ চুলের প্রকাণ্ড কবরীটা খসিয়া পড়িয়াছে, কতদিন ওর চুলে তেল পড়ে নাই কে জানে··· ।

কাজল সত্যই কালো, প্রশংসা করিবার মত রূপ তাহার নাই, এ কথা সত্য…

পরাশরকে দেখিয়া কাজল সন্ত্রস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া সুব্রতকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, কে এসেছেন দেখ এসে দাদা…

কাজলের গলার স্বরে কিন্তু আনন্দের রাগিনী বাজিতেছে; অন্তরের আবেগ যেন সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে…কাল বিজনের ব্যাঞ্জোতেও এই আবেগভরা আনন্দের ঝঙ্কার শুনিয়াছিল পরাশর।

বাহিরে আসিয়া সুব্রত পরাশরের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল: এসেছ তাহলে…ওগো, শুনচো…রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এস না…কে এসেছে দেখবে এস…

পরাশর যেন ওদের বাড়ীতে মাননীয় অতিথি, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে আসিয়াছে রাজার দুলাল…

পরাশরকে শীলা কখনও চোখে দেখে নাই, কিন্তু স্বামীর মুখে তাহার গল্প এত বেশী শুনিয়াছে, পরাশর আর তাহার কাছে অপরিচিত স্বামীর বন্ধু নহে, আত্মীয়, পরমাত্মীয়…

ছোট ঘরে মলিন শয্যাটীর উপর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সুব্রত কুণ্ঠিত গলায় কহিল, আঃ কিসে বসবে বলতো, কাজল তোর সেই পাড়ের সুজনীটা বার কর না ভাই…

কাজলীর হাতের তৈয়ারী নানা রকম কাপড়ের পাড়ের শয্যা-

স্মরণটাই উহাদের একমাত্র শয্যার দৈন্যতা লুকাইয়া মান বাঁচাইতে পারে।

পরাশর কিন্তু সেই মলিন শয্যার একাংশ চাপিয়াই বসিয়া পড়িল, কাজলীর সঙ্কুচিত মন কিন্তু চুপি চুপি কহিল, সুজনীর দুর্ভাগ্য...জীবনের শ্রেষ্ঠ অতিথিটির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইল। সে এইবার সে-টা. টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে···

সুব্রত শীলাকে দেখাইয়া কহিল, ইনিই আমার—বুঝেছ তো.. যৌবনের স্বপ্ন··· ! শীলা একটু চার জল বসাও গে···

পরাশর দেখিল ওই অতি সাধারণ লাজুক মেয়েটাই শেষে সুব্রতর জীবনের অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে···কিন্তু ওই শীর্ণ স্বাস্থ্যহীন মেয়েটিকে লইয়া সুব্রত কি স্বপ্ন রচনা করে···

সুব্রতর সময়ই বা কোথায় ?

চারিটি ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে সুব্রতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ততক্ষণে; ছোটটী মুখের ভিতর চারটী কচি আঙুল পুরিয়া বড়দিদির কোলে চড়িয়া পরাশরকে দেখিয়া কহিতেছে, প্‌পা···পপা···ব্বা···

নধরকায় সুন্দর শিশু···এখনও বোধ হয় মাতৃস্তন্যের অভাব ঘটে নাই, না হলে আরও তিনটির দেহ দেখিলে চোখে জল আসে···সুব্রত এ করিয়াছে কি...নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার যার ক্ষমতা নাই।

ইহাদের মর্ত্ত্যে আনিয়া এই নিষ্ঠুর শাস্তি দিবার তাহার অধিকার আছে কী ?

উলঙ্গ বাস্তবের রূপ কি এত অসহ…এ ঘরের বাতাসও কি গরম, কোথা দিয়া গানের একটা সুর ভাসিয়া আসিতেছে…যেন ইহাদের কাছে বিশ্রী বে-মানান লাগে…

সুব্রতর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া পরাশর কহিল, বিয়ে তাহলে শেষ পর্য্যন্ত করলে ? তারপর কাজ কর্ম্ম কেমন চলছে… কাজলী কি আর পড়ে, না পড়া ছেড়ে দিয়েছে ? তোমার মা, আর ভাই দুটী কোথায় ?

প্রশ্নের জালে জড়াইয়া পড়িল সুব্রত, বড় খুকীকে একটা ধমক দিয়া কহিল, মানু এখান থেকে পালা, তোর মা চা আনছে কি-না দেখে আয় দিখিন।

বড় মেয়েটী ধমক খাইয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার পর অস্পষ্ট গলায় ধীরে ধীরে কহিল, মা-তো ওদের বাড়ী গেছেন চাল—

সুব্রতর রক্ত চক্ষুর একটু ইঙ্গিতে মেয়েটী ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল…পরাশর ভাবিল. ছোট শিশু, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা এখনও কহিতে শিখে নাই…পিতার এই দৈন্যতা ঢাকিবার প্রয়াস সে বুঝিবে কি ?

পরাশর লজ্জিত হইয়া ভাবিল, ভুল করিয়াছিল এখানে আসিয়া ; ইহাও সেই ব্যথাতীর্থ…ভিন্ন ভিন্ন রূপই শুধু…

গলার স্বরকে জড়তা মুক্ত করিয়া সুব্রত কহিল, কি বলছিলে

পরাশর, আমার বিয়ের কথা জিগ্যেস করচো? স্নেহময়ী মা'রা যে নাতির মুখ না দেখে স্বর্গে যাবার রাস্তা খুঁজে পান না কি না...তাই; বাবা আর মা, জোট পাকিয়ে আমার চাকরী পাবার আগেই বিয়ে দিয়ে দিলেন, তারপর সংসারের অবস্থাও খারাপ হয়ে আসছিল, বাবা পড়লেন দেনার জালে জড়িয়ে...তাই মনের যা ছিল আকাঙ্ক্ষা, তা আর ফোটবার অবসর পেল না···না পেলাম সুন্দরী তরুণী প্রিয়া, না গেলাম ইউরোপ; বহুদিনকার সাধের ইউরোপ···রাত্রে শুয়ে শুয়ে যার স্বপ্ন দেখতাম···রবি ঠাকুরের ইউরোপ ভ্রমণ পড়েছিলুম ছেলে বয়সে; তখন থেকেই সাধ জেগেছিল মনে...

সুব্রতর গলার স্বর আবেগের বাষ্পে অকস্মাৎ গলিয়া যেন কান্নায় রূপান্তরিত হইয়া গেল···

সমবেদনার সুরে পরাশর কহিল, কিন্তু তোমার বাবার ব্যাসা কি তাহলে—

সুব্রত হাসিল-মৃত্যু মলিন মুখে যেমন ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যায়, এ সেই আয়ুহীন হাসি···

সে যদি থাকত পরাশর তাহলে কি আজ তুমি আমাকে দেখতে এমনি পরিবেষ্টনীর মাঝে···আমি থাকতাম এতদিনে কোথায়? যাক···কাজল পড়া ছাড়েনি...ওরই একটা স্কুল মিষ্ট্রেস ওকে দয়া করে এমনিই পড়িয়ে যান, কলেজেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি···কাজলের এটা সেকেণ্ড ইয়ার চলচে···আর মা, বিধবা

মাকে আর এ কষ্টের ভেতর রেখে কি করব ভাই, মামার বাড়ীতে তারা আদর করে মাকে নিতে চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে ভাই দুটীকেও, আমি আর আপত্তি করিনি। অক্ষম সন্তান আমি, তাই মাকে দু'মুঠো—

গলা বুঝি আবার ধরিয়া আসিল সুব্রতর। এমনি অক্ষম সকলেই, কেহই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না...। শুধু চিত্র করা চক্ষু দিয়া দেখিয়া যাও, দেখিয়া যাও জগতের বিচিত্র কর্ম্ম পদ্ধতি...

কিন্তু আর নয়, পরাশর আর শুনিতে পারে না...ইহারই মধ্যে ওর আদ্দির পাঞ্জাবীটী ভিজিয়া গিয়াছে...। রুমালে মুখ মুছিয়া পরাশর পকেট হইতে সুদৃশ্য সিগ্রেট কেশটী বাহির করিয়া দুইটী সিগ্রেট লইয়া একটি সুব্রতকে দিল। সুব্রত সেইটী গ্রহণ করিয়া কহিল, খুব দামী সিগ্রেট তো খাচ্ছ, সুন্দর...আমার বিড়ি কেনবারই পয়সা জোটে না তাতে আবার সিগ্রেট...

অর্থের অভাবে সুব্রতর রুচিও সমভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বিড়ির নামে যে নাকে রুমাল চাপা দিত।...

পরাশর আর কি কথা কহিবে, কথা খুঁজিয়া পায় না...। ইতিমধ্যে শীলা আসিয়া দুই পেয়ালা চা ও দুইটী কাঁসার ছোট বাটীতে একটু একটু হালুয়া রাখিয়া কহিল, চা টুকু খেয়ে নিন জুড়িয়ে যাবে...এস মামু, তোমরা রান্নাঘরে এস...

মানু দরজার বাহিরে গিয়া মাকে কহিল, আমাদেরও হালুয়া দেবে না মা··· ?

'তোমাদের আর একদিন করে খাওয়াবো মা, আজ ভদ্রলোক খাবেন ."

কচি গলার কণ্ঠস্বর পরাশরের কান এড়াইয়া গেল না··· ।

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত চায়ের পাত্রটী টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে কহিল, কাজলকে তো আর দেখছি না সুব্রত, তাঁর বুঝি নতুন করে লজ্জা হয়েছে ?

সুব্রতর মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মুখের চা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, কাজলী পাশের বাড়ীর একটী মেয়েকে গান শেখায় কি না, বোধহয় তাই গেছে···

পরাশর পেয়ালাটা নামাইয়া কহিল, আজ আর নয় সুব্রত ; অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেলাম, এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছি. এতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি···আচ্ছা...

সুব্রত কহিল, আমার নিজের দুঃখের কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলাম পরাশর, তোমার কথাতো কিছুই শোনা হল না···

পরাশর স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, শুনবার মত কিছুই নেই, যা ছিলাম তাই আছি···যেও একদিন, বৌদি আর কাজলীকে নিয়ে···মা খুব খুসী হবেন...আর আমারও দিনটা কাটবে ভাল, বুঝলে, যেও ?······

...বাহিরে আসিয়া পরাশর প্রাণ ভরিয়া খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস লইল। এতক্ষণ সে যে কি করিয়া ওই বদ্ধ গৃহের মাঝে বসিয়াছিল!

কিন্তু অভাগা সুব্রত...

নয়

আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনার অন্ত নাই।

ছোট্ট রূপালী তরণীর মত বাঁকা চাঁদখানিকে তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে…হয়তো একটু পরেই আকাশের বুকে স্তরে স্তরে কালো মেঘ জমিয়া উঠিবে, ঠাণ্ডা বাতাস জানালার খোলা পথ দিয়া হু হু করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া পরাশরের টেবিলের উপরকার কাগজপত্র এলোমেলো করিয়া দামাল শিশুর মতই পলাইতেছে ও পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে।

পরাশরের ঘুম নাই চক্ষের পাতায়, মন হইয়াছে অস্থির চঞ্চল …রাত্রি দ্বিপ্রহরও বুঝি অতীত হইয়া যায়…নিঝুম পুরীর দ্বার রক্ষকের মত একলা সে বিনিদ্র চক্ষে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত শুধু একাকী জাগিয়া কাটাইতেছে…

টেবিলের উপর একজোড়া তাস পড়িয়াছিল, পরাশরের পেশেন্স খেলার ঝোঁকটা ছিল বরাবর…যখনই একা থাকিত, ওই তাসগুলি লইয়া বসিত…কিন্তু আজ আর উহা স্পর্শ করিবারও ইচ্ছা নাই…

কেতকী উমা ও কাজল, এই তিনটী মেয়ে…তিনটী নারীর বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন জীবন যাত্রা দেখিয়া সে শুধু ভাবিতেছিল ইহার মধ্যে কে বেশী সুখী। পৃথিবীতে আসিয়া জীবনের পাত্র রূপে রসে গানে গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে কাহার?

বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উমাকেই বলিতে হইবে সুখী উমা। কিন্তু উমা সত্যই সুখী নহে, উমার মনে প্রচুর অহঙ্কার, সে বিজয়িনীর গর্ব্ব লইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পুরুষকে অবহেলার চক্ষে দেখে···সে ভাবে তাহার যোগ্যতম পুরুষটীকে গড়িতে বুঝি বিধাতা ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন···। বড় দর্প তার···মেয়ে হইয়া জন্মিয়া সে কাহাকেও ভালবাসিবে না, কাহারও ভালবাসা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবে না, এত অহঙ্কার কেন?

কিন্তু ওই অপরাজিতা মেয়েটীকেই জয় করিবার লালসা বুঝি কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে পুরুষের অন্তরে জাগে।···

আর কাজল, কাজলের মত রূপহীনা মেয়েটীকে স্বেচ্ছায় কেহ ভালবাসিয়া হয়তো গ্রহণ করিবে না···উহার ভবিষ্যৎ তো জল্-জ্বল্ করিতেছে। সুব্রতর আয় অতি অল্পই···সুতরাং···

ভবিষ্যতে দেখা যাইবে কোনও স্কুলে কাজলকে, একদল ছাত্রীদের সুমুখে বসিয়া কাজল প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছে···যৌবন থাকিতেও যৌবনকে সে উপভোগ করিতে পারিবে না···তার মেয়ে-মনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ নিদারুণ অভাবের পায়ের তলায় পিষিয়া মরিবে।···অল্প বয়সেই তার মেজাজ হইয়া উঠিবে রুক্ষ, নীরস...

সে যেন অর্থ উপার্জ্জনের একটা যন্ত্র...!

তবু, সকলেরই একটা আশ্রয় বলিয়া বস্তু আছে···জুড়াইবার

যৎসামান্যও স্থান আছে···কিন্তু টুমুর?···না···কেতকীর কোন উপায়ই অবশিষ্ট নাই, কেতকী হয়তো এখনও পাত্রের পর পাত্র কারণ-বারি রায় মহাশয়কে ঢালিয়া দিতেছে ও ভক্তিভরে নিজেও পান করিয়েছে .. !

হিন্দু ধর্ম্মে ডিভোর্স-এর প্রয়োজন বুঝি ইহাদের জন্যই···কিন্তু তাহা আজিও হয় নাই...

অথচ ও দেশের মেয়েরা...

তাই তাহারা দুঃখ কেমন জানে না, জানে শুধু সুখ, আর আনন্দের স্রোতে স্বেচ্ছামত ভাসিয়া বেড়াইতে।...

কিন্তু কোন উপায়েই কি কেতকীকে আর ফিরাইয়া আনা যায় না···! যদি সে উপায় কেহ বলিয়া দিত···

পরাশর তাহা হইলে কাহাকেও চাহিত না; সমাজ সংসার সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিয়া কেতকীকে লইয়া দূরে, বহুদূরে চলিয়া যাইত, তাহাদের সন্ধান কেহ পাইত না...

কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুর···।

রাত্রির এই অন্ধকারে তাহার মনে এইরূপ নানা অসম্ভব কল্পনার ফুল ফুটিয়া উঠে, প্রভাতের আলোয় কিন্তু তাহাদের রূপ মলিন হইয়া যায়, রঙও যায় বদলাইয়া··· !

ঝম্ ঝম্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি নামিয়াছে, তালে তালে যেন কোনও নৃত্যকুশলা রূপসী অপ্সরার নূপুরের ধ্বনি ঝিম্ ঝিম্ রিম ঝিম্ করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। কখনও মৃদু কখনও দ্রুত সে সুর···

বর্ষার রাগিনী, কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে পরাশর এক সময় টেবিলের উপর মাথা রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে ..।

প্রত্যূষে ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই মিণ্টু, তাহার সেজ কাকীমার মেয়ে—পুরু নীলাভ একখানি লেফাফা তাহার হাতে দিয়া বলিল, একটা দরোয়ান এসে দিয়ে গেল রাঙাদা, নেপালী দরোয়ান···

পরাশর বুঝিতে পারে, শিরোনামায় যাহার হাতের লেখা, সে উমা ভিন্ন কেহ হইতে পারে না...।

সত্যই, উমাই ছোট্ট চিঠিখানি পাঠাইয়াছে নেপালী দারোয়ান-কে বখশীদের লোভ দেখাইয়া।

পরাশর,

ন'টার ভেতর এখানে আসা চাই, দমদমায় যাব মোটরে। তুমি আর আমি···এমন সুন্দর ট্রিপ্, আশা করি আসচ?

উমা।

রহস্যময়ী উমার এ আবার কী নূতন ধরণের রহস্য··

পরাশর বাথরুমে গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া ছোট ষ্টোভটা জ্বালিয়া নিজেই জল গরম করিতে বসে···সেভ্ করা এবং চা খাওয়া, দুই কাজটাই যাহাতে সম্পন্ন হয়।

আটটার পূর্ব্বেই সে প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সাজসজ্জা করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঠাকুর ঘরে শীতল দিয়া মা-ও সবেমাত্র নীচে নামিয়া আসিয়াছেন, পরাশরকে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি

উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস বাবা ?

চওড়া লালপাড় সাড়ী পরা গৌরবর্ণা মার কমনীয় দেহ, সুন্দর ললাটে বড় করিয়া সিন্দুর-বিন্দু আঁকা, মার মুখ যেন দেবী প্রতিমার মতই···

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া পরাশর একটু কুণ্ঠিত গলায় কহিল, একটী বন্ধু আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন মা···

মা কহিলেন, আচ্ছা, একটীবার আয় দিখিন আমার সঙ্গে, ঠাকুরের একটু প্রসাদ খেয়ে যাবি··· ।

পরাশর দ্বিরুক্তি করিল না, লঘুপদে মার সহিত পুনরায় উপরে উঠিল। ঠাকুর ঘর হইতে ধূপ-ধূনা ও ফুলের মিশ্রিত সুন্দর গন্ধ আসিতেছে, দেহ মন যেন জুড়াইয়া যায়। পরাশর জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল।

একটী রেকাবীতে কিছু ফল-মূল ও দুইটী সন্দেশ দিয়া পরাশরের হাতে রেকাবীখানি তুলিয়া দিয়া মা কহিলেন, আর কতদিন এমনি টো-টো করে ঘুরবি প্রিয়, আমাদের সেই অপরাধটা কি তুই ভুলবি না বাবা ?

মা !

পরাশর যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল !-- অপরাধ কি বলছ মা, কেন আমাকে এমন করে পাপের ভাগী করছ ?···আমি কি করেছি···

বলিতে বলিতে পরাশরের দুইটী চক্ষু যেন ছলছল্ করিয়া উঠিল।

মা তাড়াতাড়ি নিজের ভুল সংশোধন করিয়া কহিলেন, অপরাধ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েচে বাবা। আমাদের ভুল, যে ভুলের জন্যে একটা মেয়ের সমস্ত জীবন আমরা নষ্ট করে দিলুম। কিন্তু যা হয়ে গেছে, আর তো তা ফেরাবার উপায় নেই বাবা! বলছিলুম, সত্যিই এবার তোর বিয়ের চেষ্টা দেখি, কেমন?

পরাশর শূন্য রেকাবীখানা মেঝের উপর সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিয়া ব্যথিত গলায় কহিল, কি করে তুমি বিয়ের কথা বলছ, মা?

মা করুণকণ্ঠে কহিলেন, সবই বুঝতে পার্চ্ছি প্রিয়, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি তো তোদের কাছে চিরদিনের জন্যে আসিনি...তোর এই ঘরছাড়া পাগলা মনটাকে কে বেঁধে রাখবে বলতো?

পরাশর গাঢ় স্বরে কহিল, ওসব কথা আমাকে শুনিও না মা। নিজের পায়ে এখনও ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলুম না, আমি বিয়ে করবো কি! বউ এনে তার নিত্যি নূতন-ফ্যাশানের সাড়ী-ব্লাউস কেনবার টাকা কই আমার?

মা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, হ্যাঁ-রে তোর কি টাকার অভাব আছে প্রিয়, এত বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর জায়গা জমি, এ সব কার, তোর নয়?

পরাশর মাথা নাড়িয়া কহিল, না মা, ও সবে আমার অধিকার নেই, ধরে নাও না কেন, আমি তোমাদের ত্যজ্যপুত্র...

মা ছল্‌ছল্‌ চোখে চাহিয়া কহিলেন, সবাই কি আর চাকরী

করবার পরে বউ আনে বাবা...আগে তুই ঘরের লক্ষ্মী আন দেখি ঘরে, দেখবি, তোর চাকরী আপনি হয়ে যাবে।...

পরাশর ছোট্ট একটী উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল। তাহার পর মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, বিয়ের পরে চাকরী করা উচিত নয় মা, আগেই করা ভাল। তুমি তো জানো না, আমারই এক বন্ধু ..মা সে দুর্গতি তুমি চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না! ..সে ও এক বড় ঘরের ছেলে, জীবনে দেখত সে বড় হওয়ার স্বপ্ন...কিন্তু ওই সর্ব্বনেশে বিয়েই মা—বাবা উঠেছেন মা, আমি পালাই...

ত্রিতলের বারান্দায় খড়মের খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইতেই পরাশর বাহিরে আসিয়া হেঁট হইয়া জুতাটী হাতে করিয়া আস্তে আস্তে নামিয়া গেল।...

দশ

পরাশরের প্রতীক্ষায় উমা তখন অস্থির-চঞ্চল মনে একবার ঘর, একবার বাহির করিতেছিল। উমা যাইবে দমদমে, তাদের যেন নূতন বাগান বাড়ীটা কেনা হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত উমা তাহা দেখে নাই। মা-কে বলিতে মা সম্মতি দিলেন। মা উমার প্রকৃতি জানিতেন, উমা সহসা মুখে বলে যাহা, তাহা কাজেও করিতে দ্বিরুক্তি করে না···তার কোন কাজে কেহ কখনো বাধা দিতে পারে নাই বাধা দিলেই অনর্থ বাধিত···।

ছেলে বয়সে পিতাকে হারাইয়া সে মাতার অত্যধিক আদর-যত্নে একটু দুরন্ত প্রকৃতির হইয়াছিল।

মার আপত্তি না করিবার কারণও ছিল, পরাশরকে তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। কন্যার এই খাম-খেয়ালী মনটা যদি পরাশরের দিকে নত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সকল দিকেই রক্ষা হয়।

পরাশরকে আসিতে দেখিয়া উমা ছুটিয়া আসিয়া দ্রুত গলায় কহিল, ন'টা বেজে গেছে কখন...সে খেয়াল আছে পরাশর? কি কাজ তোমার এত বল তো?

হাসিয়া পরাশর উত্তর দিল, কিছুই না, কাজই তো একটা খুঁজচি উমা···যে কোন একটা কাজ পেলে আমি বেঁচে যাই···। কিন্তু

হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে-টা এত প্রবল হল কেন বল দেখি?

উমা স্ফুরিত অধরে কহিল, কেন আবার, ইচ্ছে কি কারুর হয় না? এস মোটর তৈরী আছে। আমি কিন্তু ড্রাইভ করবো—কেমন?

পরাশর হাসিয়া কহিল, ক'জন লোককে চাপা দেবার মতলব আছে উমা?

উমা প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ভঙ্গীতে কহিল, যাঃও, ও রকম ক'রলে তোমার সঙ্গে যাব না···তুমি ভয়ানক যা-তা বল।

—তবে যেওনা, আমি যাই?

উমা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, এস। মাকে বলা আছে, মা অনেক খাবার তৈরী করে দিয়েছেন। ফিরবো দু'টোর ভেতরে··· কেমন?

পরাশর কহিল, আচ্ছা, আরও দেরী হলে ক্ষতি নেই... তোমার আদেশ অমান্য করা অ.মার সাধ্য নয়।

পাশা-পাশি দুই জনে মো ়রে গিয়া বসিল। উমা হাসিমুখে পরাশরের দিকে চাহিয়া কহিল, এবার তবে যাত্রা সুরু করি?

পরাশর স্মিত মুখে কহিল, আমাকে বলচো কেন উমা... তোমার ইচ্ছে···।

ষ্টিয়ারিংএ হাত দিয়া উমা কহিল, বেশ

হু-হু করিয়া মোটর চলিল।...সহর ছাড়াইয়া মোটর গ্রাণ্ড-ট্যাঙ্ক রোড ধরিল...উদ্দাম বাতাসে উমার ধানী-রঙের সিল্কের

সাড়ীর আঁচল বার বার উড়িয়া পরাশরের গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল।...ক্যালিফোর্ণিয়ার উগ্র গন্ধ···উমার আরক্ত কপোলে চূর্ণ কুন্তলগুলি রেশমের গোছার মত উড়িতেছে। ওর সুন্দর শঙ্খ-শুভ্র লীলায়িত বাহুর সৌকুমার্য্য···ললাটের দীপ্তি···পরাশরের চিত্তকে এক নিমেষে উন্মনা করিয়া তুলিল।

টুমুর স্মৃতি যদি তার স্পর্শালু চিত্তের আকাশে তরুণ সূর্য্যের মত আপন গরিমায় উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া না থাকিত, তাহা হইলে পরাশর এই রঙীন মুহূর্ত্তে কি যে করিত বলা যায় না...। এই আনন্দে, এই উদ্দাম আনন্দে তার বুকের রক্ত স্রোত আর মৃদু নহে,···দ্রুত বেগে বহিতেছে।...বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিয়া যে শব্দ উত্থিত হইতেছে, পরাশর যেন নিজে সে শব্দ কান পাতিয়া শুনিতে পাইতেছে।...

উমা দুই ধারের শ্যামল শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ-স্বরে কহিল, বাঃ, বাংলা দেশের সুষমা দেখলে দেহ মন জুড়িয়ে যায়, না পরাশর? আচ্ছা কোলকাতার গাছ পালা এত সবুজ, সুন্দর, হয় না কেন বলতে পারো?

পরাশর যেন উর্দ্ধলোকে হইতে নামিয়া আসিল: কি বলচ উমা? কোলকাতার গাছ-পালা এত সবুজ হয় না কেন? কোলকাতার মাটী তো এত সরস নয়...মাটী যেখানে অনুর্ব্বর, সেখানে গাছ-পালা সতেজ হবে কি করে?

উমা ও-ধারে মুখ ফিরাইয়া কহিল, পাড়াগাঁয়ের লাজুক বউদের

অবস্থা দেখ পরাশর। পুরোপুরি ঘোমটা-টুকু দেওয়া আছে, কিন্তু এদিকে মোটর দেখবার কৌতূহলও বড় কম নয়, দেখচ!…ওরা দু' আঙুলে ঘোমটার ফাঁকে কি রকম করে আমাদের দেখচে…ও-মা মাছরাঙ্গা পাখী গুলো কি সুন্দর দেখ পরাশর!…আর ওরা চুপড়ী হাতে কি তুলচে…শাক ?…

পরাশর হাসিতে হাসিতে কহিল, উমা, এতটা লক্ষ্য করা ভাল নয়, যে-হেতু তুমি চালাচ্ছ গাড়ী, শেষে কি একটা বিপদ বাধাবে ?

উমা আরক্ত মুখে কহিল, বাধলেই বা, না হয় গাড়ীখানা কোন গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে, আর তুমি আর আমি এক সঙ্গে হাসপাতালে আশ্রয় নেব… ! কোলকাতায় যাবে টেলি…

পরাশর কহিল, অতটা ভাল নয় উমা…কোন ক্ষণে মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে যায়…সাবধান হয়ে পথ-চলা ভাল…এই—গিছল গাড়ী খানা…

একখণ্ড ইঁটের ধাক্কায় গাড়ীখানা লাফাইয়া উঠিল…উমা নিপুণ-হাতে গাড়ী চালাইতে চালাইতে কহিল, কিছু হবে না…ঈশ্বর আছেন, বিপদে আপদে তিনিই রক্ষা ক'রবেন…।

পরাশর মৃদু স্বরে কহিল, তুমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো উমা, তিনি কি আছেন সত্যই ?

উমা বিশাল চক্ষু তুলিয়া আশ্চর্য্যের সুরে কহিল, বাঃ…তুমি

আবার এতটা নাস্তিক হলে কবে থেকে পরাশর! তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানো না··· ?

পরাশর কহিল, ফ্রয়েড কি বলেন জানো? এ-সব কিছুই বিশ্বাস করবার মত কথা নয়...কল্পনা-বিলাসী ভাবুক লোকেদের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র।···আইনষ্টাইনও বলেন···

মাথাটা ঝাঁকাইয়া উড়ন্ত চুলগুলিকে কপোল হইতে সরাইয়া উমা কহিল, রক্ষে কর পরাশর, এ সময়ে তুমি ফ্রয়েড আর আইন-ষ্টাইনের কথা পেড়' না···তাহলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না···। আইনষ্টাইনের মত mysticও আবার এ কথা বলেন, যে "মানুষ চন্দ্র-সূর্য্যের মত এক অ-দৃষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই চলেছে"···! সেই অ-দৃষ্ট, অ-পূর্ব্ব শক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের ধারণারই অনুরূপ। কিন্তু তুমি তো আইন্‌ষ্টাইন নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতে না...দেশ-বিদেশ থেকে ঘুরে এলে কি এই সব জ্ঞান সঞ্চয় করে?

পরাশর কহিল, কিন্তু তিনি যদি তোমাদের সর্ব্ব-ঘটে-পটে অধিষ্ঠিত···তবে মানুষের কান্নায় সাড়া দেন না কেন? বঞ্চিত মানবের করুণ ক্রন্দনে তাঁর মন গলে না,পাষাণ ভেদ করে সে কান্না তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে না, কেন? কেন তবে তিনি এত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম! তাঁর নাম না ব্যথা-হারী, দয়াময়···

পরাশরের দুইটী চক্ষু ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মুখে চোখে যেন আগুনের দীপ্তি।

উমা স্থির গলায় কহিল, মানুষ নিজের কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে, সেজন্যে তাঁকে দায়ী করা বৃথা···নিজের অদৃষ্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার দরকার···। এ জন্মে যা তুমি পেলে না, পরজন্মে তা পাবে···অন্ততঃ সেই পাবার আশা করবে।···

পরাশর কহিল, মরণের পর তো সব ফুরিয়ে যাবে উমা···?

—তুমি নিরীশ্বর বাদীর মত কথা বলচ পরাশর···এখানেও সেই ফ্রয়েডের সুর। মরণের পর কিছুই ফুরোয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই থাকে, যদি সাধনার জোর থাকে, তাহ'লে তোমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াবে···। এইখানে থামব এবার পরাশর, ও-কে আসছেন, বল তো?

পরাশরদের গাড়ী থামিতে দেখিয়া একটী খদ্দর-ধারী বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া হাসি মুখে কহিল, চিনতে পাচ্ছ পরাশর?

পরাশর দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, সাগ্রহে সে হাত বাড়াইয়া কহিল, পেরেছি। তুমি না অন্তরীণ ছিলে?

সুদর্শন স্মিত-মুখে কহিল, ছিলাম, বেশী দিন নয়। বিনা অপরাধে আমাকে ধরা হয়েছিল। আমারই নামের একটী ছেলে যথার্থ অপরাধ করেছিল।···কিন্তু আমার ও সব বালাই নেই! গরীবের ছেলে, ওদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবো না তার চেয়ে যতটা পারি, ঘরে বসেই দেশের কাজ করি।···দস্তুর মত মাটী কুপিয়ে আবাদে সোনা ফলিয়েছি ভাই···একটা তাঁতও বসিয়েছি···।

এস, আর আমার এখানেই যা-হোক দু'ঠো ক্ষুদ কুঁড়ো মুখে দেবে, এস!...ইনি—

উমার দিকে চোখ পড়িতেই সুদর্শন প্রশ্ন-সূচক দৃষ্টিতে চাহিল। পরাশর অগ্রসর হইয়া কহিল, মেজর আর, কে, সেনের দৌহিত্রী! .. এঁর বাবা হাইকোর্টের জজ ছিলেন...ইনি মিস্ উমা গুপ্ত—উমা, ইনি আমার বন্ধু সুদর্শন গুপ্ত···

উমা দুইটী করতল একত্র করিয়া ছোট্ট একটী নমস্কার করিয়া পরিচ্ছন্ন গলায় কহিল, কাগজে এঁর নাম দেখেছি।···কিন্তু ইনি যে তোমার বন্ধু, তা জানতাম না...সত্যি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।...

সুদর্শন প্রীত গলায় কহিল, তবে, গরীবের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করবেন, দয়া করে চলুন।···আপনাদের গাড়ীখানা দূর হতে আমি দেখতে পেয়েছি···কিন্তু পরাশরকেই চিনতে পেরেছিলাম, আপনার সঙ্গে তো আলাপ ছিল না। এখানে কি কারুর বাড়ী বেড়াতে এসেছেন? তাহলে—

উমা ব্যগ্র গলায়, কহিল, না—না, এমনিই এসেছি···মানে একটা বাড়ী নেওয়া হয়েছে—সেটা আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি বলে···

সুদর্শন কহিল, ও। আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়ার পর তা দেখলেই হবে···আসুন, আমার তাঁতশালা আর ধান-জমি দেখবেন, এ দিকটায় কোনদিন এসেছিলেন কি?

উমা চলিতে চলিতে মৃদু গলায় কহিল, কোনদিন না...ও-টা কি, স্কুল ?

—না ও-টা লাইব্রেরী, ও-টা আমিই করিয়েছি···একটী মাত্র লাইব্রেরী। অথচ পাঠকের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে···। ওই দেখুন আমার ছাত্ররা বাগানে কি রকম মালীগিরি করছে...। ও-রা নিজের হাতেই মাটী কোপায়, পুকুর থেকে জল আনে, ফল-ফুলের গাছ নিজের হাতেই পোঁতে।...দু'ঘণ্টা এই কাজ করবার পর ও-রা খাবার ছুটী পাবে !...ওদের জন্যে কিন্তু ঠাকুর নেই, ওরা নিজেরাই রাঁধে বাড়ে, আবার সন্ধ্যেটা যদি থাকতেন, তাহলে শুনতেন ওদের গান-বাজনা···

উমা সুদর্শনের কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ স্বরে কহিল, আপনি দেখছি শান্তি নিকেতনের আশ্রমটাকে তুলে আনবার চেষ্টা করছেন... রবিঠাকুরের পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন ?···

সুদর্শন কহিল, তাঁর মত শিক্ষা দেব এমন স্পর্দ্ধা আমি করি না... তবে যে-টুকু আমার সামর্থ্যে কুলোয়···সেই-টুকু।···এই আমার কুঁড়ে ঘর, এস পরাশর, আসুন উমা দেবী।

কুঁড়ে-ঘরই সত্য, কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন, ঘর হইতে দাওয়া পর্য্যন্ত তক-তক করিতেছে। চাহিয়া দেখিবার মত। আঙ্গিনার দুই ধারে মল্লিকা ও বেলের ঝাড়, শ্বেত ও রক্ত করবী তাহারই মাঝে-মাঝে লাগানো ; ঘরের দ্বারের দুইপাশ দিয়া মাধবীলতা খুঁটী বেড়িয়া উঠিয়াছে···উঁচু রোয়াকের উপরেও সারি-সারি গোলাপের

চারা বসানো ··টকটকে লাল ও গোলাপী, সাদা ও সোনালী কত রঙের গোলাপ ফুটিয়া ছোট বাড়ী খানি রঙে-গন্ধে মাতাইয়া তুলিয়াছে।...প্রকাণ্ড একটা পিতলের দাঁড়ে বসিয়া একটা সাদা কাকাতুয়া মানুষের মত অবিকল ভঙ্গীতে কহিল. আসুন, আসুন···

উমা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে আবার কহিল—নমস্কার, আসুন, আসুন !···

পরাশর কহিল, এ কোথায় এলাম হে ? মনে হচ্ছে সেকালের কোন মুনি ঋষিদের তপোবনে ঢুকেচি...একাই থাক নাকি ?

সুদর্শন স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, তা ছাড়া আবার সঙ্গী কোথায় পাব ? তবে রাত্রি-টুকুই যা একলা। সারাদিন তো আমার ছাত্রদের নিয়ে, আর ক্ষেত-খামার নিয়েই কাটে...সত্যি অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় আনন্দ পেলাম পরাশর।··· তোমরা এখানটায় একটু বসো ভাই, আমি রান্নাবাড়ী থেকে এক্ষুনি ঘুরে আসচি।...

সুদর্শনের সুদর্শন-মূর্তি চক্ষের বাহিরে অদৃশ্য হইলে উমা নিম্ন-গলায় কহিল, কী চমৎকার বাড়ীখানি সাজিয়েছেন, না পরাশর ? আচ্ছা উনি বিয়ে করেন নি, বুঝি ?

পরাশর কহিল, করেছিলেন। সে স্ত্রী গত হয়েছেন। বিয়ের পর মাত্র দু বৎসর না কি তিনি বেঁচে ছিলেন। সুদর্শন তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সুদর্শন, আমি আর সুব্রত একসঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে এম-এ দি···কিন্তু সুব্রত আর আমি ফেল করলুম, আর ও ফার্ষ্ট ক্লাস

ফার্ষ্ট হল !…শুনেছিলুম ও 'ল' পড়ছে…তারপর থেকে আর কোন খবর পাইনি… ।

উমা একটা ভঙ্গী করিয়া কহিল, পাবেই বা কোত্থেকে !…তুমি কি আর এ মুল্লুকে ছিলে ? বিরহী যক্ষের মত যে মেঘদূতের উদ্দেশ্যে ছুটেছিলে…!

পরাশর লজ্জিত গলায় কহিল, উমা, তোমার মুখের বাঁধন বড় আলগা হয়ে যাচ্ছে, একটু সংযত হও ।…

উমা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু কী সুন্দর এই মিঃ গুপ্ত !… অন্য ছেলেদের মত গৃহশূন্য হ'তেই আবার গৃহলক্ষ্মী আনবার জন্যে তৎপর হ'য়ে ওঠেন নি ।…আচ্ছা উনি তো চাকরী করেন না… কি থেকে এই সব তাঁ, স্কুল চলে ?

পরাশর কহিল, আশ্চর্য্য করলে তুমি উমা, কুসুমপুরের জমিদারের ছেলে ও…ওর কিসের অভাব ?…কিন্তু ও সেই জমিদারী-আবেষ্টনীর ভেতর থাকতে পারে না ।…অবশ্য এখন যে ওদের আয় খুব বেশী আছে, তা নয়…তবুও যা আছে, তাতে ওকে খেটে খেতে হয় না ।

পরাশর সিগ্রেট-কেশ বাহির করিবার জন্য পাঞ্জাবীর পকেটে হাত পুরিল ।

উমা অসহিষ্ণু গলায় কহিল, কি যে রাতদিন খাও…ঠোঁট দু'টো এমন বিশ্রী হয়ে যাবে, দেখো… !

একটা সিগ্রেট তুলিয়া ঠোঁটে চাপিয়া পরাশর অস্পষ্ট গলায়

কহিল, তুমিও খাও না কেন?…দোষ কী…আজ-কাল আলট্রা-মডার্ণ মেয়েরা তো ভীষণ স্মোক করেন… !

উমা ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া কহিল, করুক। সিগ্রেট খেয়ে যে মেয়েরা আধুনিকতার বিজয় নিশান ওড়াতে চান, আমি তাঁদের পক্ষপাতী নই।…মেয়েরা মেয়েদের নিজস্বতাটুকু বজায় রেখে চলবে। · সিগ্রেট খেয়ে পুরুষের সমকক্ষ হলাম, একথা টুকু যেন মেয়েরা ভুলতেই চেষ্টা করেন।…ওই যে সুদর্শনবাবু আসচেন, মা-গো, দেখ, আমাদের জন্যে বোধ হয় জলখাবার নিয়ে আসছেন।

প্রকাণ্ড একটা কাঠের বারকোষে আম-জাম হইতে বর্ষাঋতুর যত রকম সরস ফল-মূল লইয়া সুদর্শন দেখা দিল…তাহার পিছনে বুড়া চাকর বেহারীর কাঁধে এক কাঁদি সদ্য-পাড়া ডাব…।

সুদর্শনের এই আতিথ্যের বহর দেখিয়া উমা চঞ্চল গলায় কহিল, এসব কি করেছেন মিঃ গুপ্ত? এত খাবে কে?

সুদর্শন কহিল, খাবেন আপনারা, এখানে কিন্তু চায়ের বন্দোবস্ত নেই উমা দেবী, তাই বেহারীকে দিয়ে ডাব পাড়িয়ে আনলাম।…বেহারী কাটুক্‌ তো দেখি…উমাদেবী একটু কষ্ট করে ফল গুলো ছাড়াতে বসুন…বঁটি দিয়ে কাটতে পারবেন তো?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া উমা কহিল, তা পারবো। এগুলো আমরা জানি। মোটর ড্রাইভ্ করি বলে যে বঁটি পেতে ফল কাটতে শিখিনি তা ভাববেন না। দিন, কই বঁটি…?

পরাশর ব্যগ্র গলায় কহিল, কিন্তু, তুমি হা তই কাটবে উমা, ফল খাওয়া আমাদের অদৃষ্টে নেই হয় তো…

উমা মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিল, আচ্ছা, কাটে যদি হাত তো তোমার যাবে না—আমারই হাত কাটবে।…না সুদর্শন বাবু আপনি ওঁর কথা শুনবেন না। ··

বেহারী একখানি বঁটি আনিয়া দিলে, উমা সত্যই মেঝের উপরে বসিয়া নিপুণতার সহিত ফলগুলি ছাড়াইতে লাগিল।

বেহারী ডাব কাটিয়া পরাশরের হাতে দিলে সে কহিল, আমি এখন খাবো না…সুদর্শন বাবু, দেখুন তো আমার এগুলো কোটা হচ্ছে কি-না? এ সমস্ত ফলই আপনার বাগানের?

সুদর্শন মাথা নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, সবই আমার বাগানের তৈরী।…এক একটা জাম আর জামরুল কত বড় দেখচেন, কোলকাতায় এত বড় পাওয়া যায় না, আর এমন চমৎকার স্বাদ!…

… … …

উপকরণ অতি সামান্যই, কলাই-এর দাল, মোটা মোটা চালের অন্ন আর দু'একটা ভাজা, টাটকা মাছের ঝোল, ঘন দুধ আর আম কাঁঠাল…পরিতৃপ্তির সহিত উমা আহার করিল। কলি-কাতায় নানা ব্যঞ্জনেও যাহার তৃপ্তি হয় না…চা ও চপ কাটলেটের পরিবর্ত্তে ডাবের জলেই যেন সে বেশী তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল…। ফিরিবার সময় সুদর্শন বার বার করিয়া বলিয়া দিল: যখনই দমদমে

আসবেন, এখানে একটীবার পায়ের ধূলা দিবেন···যেন ভুলে যাবেন না...

বাগান বাড়ীখানি ঘুরিয়া আর দেখিবার সময় হইল না, দূর হইতে দেখিয়াই উমা-রা ফিরিল।

এইবার ড্রাইভ করিতে লাগিল উমা নহে, পরাশর। হাস্যময়া উমার মুখে ক্লান্তির আভাস···

ওর চিন্তাসূত্র আজ কাহাকে কেন্দ্র করিয়া জাল বুনিতেছে ?...

এগারো

অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল পরাশর : বাড়ীটা তোমার ভাল করে দেখা হ'ল না উমা···কি বল ?

অবসাদগ্রস্তার মত উমা মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, তা না হোক, তবু একজন মানুষের মত মানুষের পরিচয় তো পাওয়া গেল। পরাশর...সুদর্শনবাবুর কথা যতই মনে পড়ছে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি, এম এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্স্ট...জমিদারের ছেলে, তবু কেমন নিরহঙ্কার, উদার লোকটী, মুখে কাজের বড়াই নেই। আমাদের অন্য কেউ হ'লে কাগজে এতক্ষণ বিজ্ঞাপন জাহির করে বসতেন।

পরাশর মনে মনে হাসিয়া কহিল, সুদর্শনের ওই গুণ টুকু আছে বলেই যে কেউ ওকে দেখে—না ভালবেসে থাকতে পারে না।...নইলে তোমার মত মেয়েও সুদর্শনের প্রশংসা করচে ·· আশ্চর্য্য... !

উমা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আশ্চর্য্যের কিছু নেই পরাশর, তাঁর কাজ দেখে সত্যিই আমার ভাল লেগেছে ·।

পরাশরের অত্যন্ত অভিমানী মন যেন কোথায় এতটুকু আঘাত পাইল। সুদর্শনকে উমার ভাল লাগিয়াছে, দুইদিন পরে এই ভাল-লাগা পরিণতি পাইবে ভাল বাসায়···তাহাতে পরাশরেরই বা এমন কী ক্ষতি হইবে ? উমা তো পরাশরকে চাহে না...আর পরাশরও···

গেটের কাছে মোটর আসিয়া থামিল, বর্ষার সন্ধ্যা। টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে···রাস্তার গ্যাসগুলির কাঁচের উপর মুক্তার মত জলবিন্দুগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে।···

উমা কহিল, ড্রাইভারকে সঙ্গে দি-ই পরাশর, তুমি মোটরেই বাড়ী যাও।···যে বিষ্টি, ভিজলে হয় তো অসুখে পড়বে?

অন্য সময় হইলে উমার এই কথা কয়টা পরাশরের বিদগ্ধচিত্তে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ অনেকগুলি কারণে পরাশরের মন বিক্ষিপ্ত, সাগরের মত অশান্ত।···

তাই সে মাথা ঝাঁকিয়া কহিল, না, এত কোমল শরীর আমার নয়...আচ্ছা, আসি উমা···গুড্ নাইট।···

··· ··· ···

উমার নিকট হইতে পরাশর ভিজিতে ভিজিতেই ট্রাম ধরিল। উমা তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে, অসুখের ভয় দেখাইয়াছে! ···সুদর্শন মানুষ, আর পরাশর ননীর পুতুল...এতটুকু জলে ভিজিলে গলিয়া যাইবে···।

ফিরিবার পথে সে কি ভাবিয়া সুব্রতদের বাড়ী গেল।··· সুব্রতকে একবার ডাকিতেই কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলিয়া গেল···হ্যারিকেনটা হাতে লইয়া কাজলী দাঁড়াইয়াছিল··· পরাশরকে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল: আপনি? আমি ভেবেছি দাদা!···জলে ভিজচেন কেন, ভেতরে আসুন না···।

পরাশর ভিতরে ঢুকিয়া কহিল, সুব্রত বাড়ীতে নেই, ও···

আমি তা জানি না...তাহ'লে আমি আসি··· ?

কাজলী গাঢ়স্বরে কহিল, এই বিষ্টিতে যাবেন না একটুখানি বসুন, দাদা একটা ট্যুশানী পেয়েছেন···এখুনিই ফিরবেন। বৌদির বড় জ্বর...।

পরাশর চাহিয়া দেখিল কাজলের দুইটি হাতে ভিজা ময়দার চিহ্ন। সম্ভবতঃ সে রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে পরাশরের মনে হইল কাজলকে যতটা সে কুশ্রী বলিয়া ভাবিত, ঠিক ততখানি কুশ্রী নয়, কাজলের মুখেও লালিত্য আছে ··। টানা টানা চক্ষু দুইটীতে যেন আকাশের সুবিপুল ইসারা···। কাজল তাহাকে এত সম্ভ্রম করিয়া কথা বলে কেন ? পরাশরকে এখনও পর বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে কেন ? একটী নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধ মমতার ধারায় ওর অন্তর যে জুড়াইতে চাহে··· ?

কিন্তু মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর···।

পরাশর কহিল, তুমি বুঝি রান্না কর্চ্ছিলে কাজল ?...চল, তোমার সঙ্গে রান্নাঘরেই বসি-গে···সুব্রত ফিরে আসুক, দেখা করে যাব ..

ছোট্ট টীনের চালার নীচে রান্নাঘর...বিষ্টির তালে-তালে টীনের চালে বাজনা বাজিতেছে ঝম্ ঝম্ ঝম্···।

উনানে গণ্‌গনে আগুণ...এক দিকের দেওয়ালে একটি পরিষ্কার কাঁচ দেওয়া হ্যারিকেন ঝুলিতেছে।...কাজলের রূপ না

থাকুক, গুণ আছে যথেষ্ট, দরিদ্র ভাইএর সংসারটিকে সযত্নে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে।

পরাশর কিন্তু বসিল না, দাঁড়াইয়াই রহিল। কাজল রুটী বেলিতে বেলিতে কহিল, বৌদি যদি ভাল থাকেন তো কাল আপনাদের বাড়ী যাব। ছেলেরা বড় বিরক্ত করবে বলে যেতে ইচ্ছে করে না...

পরাশর আগ্রহের সহিত কহিল, তা হোক, যেও.. ছেলেরা গেলে আমরা বিরক্ত হই না, আমাদের বাড়ীতেও অনেক ছেলে আছে কাজল! তুমি কি কোনোদিন যাওনি, দেখনি সে বাড়ী? সব ভুলে গেছ...?

মাথাটী নীচু করিয়া কাজল সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, কিছুই ভুলি নি, কিন্তু এ কি! আপনার জামা-কাপড় সব যে ভজে গেছে... ইস্, এতক্ষণ আমারই দেখা উচিত ছিল ·। আসুন দাদার ধুতি একখানা বার করে দিই...পরুন...।

কাজল পূর্ণ দৃষ্টিতে পরাশরের পানে চাহিল, পরাশরের আদ্দির পাঞ্জাবী ও ধুতি ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে.. চশমার কাঁচেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়াছে...মাথার কেশগুলি বহিয়াও টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

পরাশরের সুন্দর, বলিষ্ঠ দেহখানির পানে চাহিয়া কাজল চক্ষু নিমীলিত করিল···পরাশর এত সুন্দর, এত রূপবান পুরুষ...

পুরুষের দেহ এত শ্রী মণ্ডিত হয়!...সিক্ত বেশ-বাসে পরাশরকে অপরূপ দেখাইতেছে...

অন্ততঃ কাজলের চোখে...।

কাজল নূতন করিয়া পরাশরকে যেন দেখিতেছে...তার অন্তরের চির-কিশোরী-রাধিকা যেন প্রথম-প্রেম-যমুনায় অবগাহন করিয়া শ্যামের পদপ্রান্তে ভক্তি-ভরে অঞ্জলী দিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে...।

আজিকার এই বর্ষণ মুখর রাত্রি...

কাজলের কাছে যেন অকস্মাৎ অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল...।

তার অন্তরের পরিচয় সে নিজেই জানিত না...আজ সে বুঝিল, জানিল, তার মন ময়ূরীর মত-নৃত্য-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন?

পরাশরও অন্তরে আজ কিসের যেন অভাব অনুভব করিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল বিবাহ করিয়া যাহারা প্রিয়ার পরিবর্ত্তে গৃহকর্ম্মে-নিপুণা স্ত্রী চাহিবে, তাহাদের পক্ষে কাজলই শ্রেয়ঃ। কাজল সেবা করিতে জানে, কাজলের অন্তর মমতায় পরিপূর্ণ...কাজল মানুষের বেদনা বোঝে।...

পরাশর কোমল গলায় কহিল, কাপড় আর ছাড়বো না কাজল, আমি বাড়ী যাই...সুব্রত'র ফিরতে বোধ হয় দেরী আছে?

কাজল নম্র গলায় কহিল, দেরী হবার তো কথা নয়, তবে আসুন, আপনার কষ্ট হচ্ছে...।

পরাশর মিষ্ট গলায় কহিল, কষ্ট এমন কিছু নয়, তবে বাড়ী

থেকে আজ বেরিয়েছি আমি কোন সকালে ফিরচি এখন। মা হয়তো কত ভাবচেন! বৌদির কি বড্ড জ্বর?

কাজল মাথা নাড়িয়া কহিল, ওঁর আজকাল প্রায়ই এমনি জ্বর আসে। বাড়ীতে হোমিওপ্যাথিক বই দেখে চিকিৎসা চলে . দাদাই ওষুধ পত্র দেন...বৌদি বলেন আমি আর বাঁচবো না। ..

পরাশর স্তম্ভিত হইয়া গেল, শীলার শরীরে তাহা হইলে দুরন্ত কাল-ব্যাধি আশ্রয় করিয়াছে...তাই ওর শরীর লাবণ্যহীন...যেন শুষ্ক একটা বৃন্ত। সুব্রত কই তাহাকে তো কিছু বলিল না...অথচ চিকিৎসা করিবার অন্য উপায় তাহার নাই...।

কিন্তু প্রবল আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন সুব্রত কি সহজে কাহারও নিকট হাত পাতিবে...!

শীলাকে ওই ব্যাধিতে ধরিয়াছে, এইবার সুব্রতকেও ধরিবে... তাহার পর কাজল...

অবশিষ্ট কাজলও ওই ব্যাধির কবলে পড়িবে। কাজল মরিবে...

... ...

ভাবিতে ভাবিতে পরাশর পথ চলিতে লাগিল, তাহারও সমস্ত শরীর যেন থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।...একটু একটু শীতও যেন করিতেছে, হয়তো এ-টা জলে ভিজিবার দরুণ... পরাশর চশমার কাঁচ দুইখানা মুছিয়া লইল।...

কাজলকে বাঁচানো যায়, যদি কেহ উহাকে আপনার করিয়া

লইয়া যায়, যদি এই বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে কেহ কাজলকে মুক্তি দেয়!...কিন্তু কে দিবে...রূপও নাই, অর্থও নাই...। কাজলকে কে সাধ করিয়া জীবন সঙ্গিনী করিবে? আর পরাশরই যদি...যদি স্বেচ্ছায় কাজলকে... ছিঃ—

কপালের দুইটী পাশ বেশ দপ্ দপ্ করিতেছে...জ্বর আসিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। পরাশর দ্রুত হাঁটিতে লাগিল। সমস্ত শরীর তাহার ভারী হইয়া উঠিয়াছে ...।

গোপনে পা টিপিয়া টিপিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া কোনও রকমে সিক্ত জামা কাপড় গুলি ছাড়িয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মন যে তাহার আজ কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে না।

উমা ও কাজল কে আজ বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে...কিন্তু উমাকে সে এইবার একটু উপেক্ষা করিতে চাহে!...উমার মত দেমাকী মেয়ের পক্ষে একটু অবহেলাটাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে...

আজই যেন সে দেখিয়াছে সুদর্শনকে ..।

কিন্তু পরাশর! এত দিনের চেনা-বন্ধু পরাশর আজ এত সহজেই তুচ্ছ হইয়া গেল! পরাশর উমার প্রতি প্রতিশোধ লইতে চাহে...।

সে ও দেখাইবে, উমার মত মেয়েকে সে ও অনায়াসে এড়াইয়া যাইতে পারে...

কিসের এত দর্প উমার!...

... ...

পরাশর যখন চোখ মেলিল, তখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র কাঁচা সোনার মত ঝলমল করিতেছে। মাথা তুলিতে গিয়া মাথা যেন অসম্ভব ভারী বোধ হইল, পরাশর বিরক্তি ভরে উঠিয়া বসিতে যাইতেই কে যেন সুমিষ্ট গলায় কহিল, উঠবেন না, আপনার এখনও জ্বর ছাড়েনি...।

—আমার জ্বর...! পরাশর কাজলের কথায় হতবুদ্ধি হইয়া কপালে হাত দিয়া উত্তাপ গ্রহণ করিয়া কহিল, তুমি কখন এলে কাজল?

—অনেকক্ষণ...আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। তা ছাড়া কাল, পরশুও এসেছি...এ তিন দিন কি আপনার জ্ঞান ছিল?

পরাশর শ্রান্ত কাতর কণ্ঠে কহিল, আর কেউ আমাকে দেখতে আসেনি কাজল?

—কই না, দেখিনি তো। আজ কেমন বোধ কর্চ্ছেন, ভাল? বাবা, যা ভয় দেখিয়েছিলেন, মা তো কেঁদেই সারা...

মা ও ঘরে কি যেন একটা কাজে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া স্নেহ ভরা কণ্ঠে কহিলেন, কাঁদবারই যে কথা, যে কাণ্ড বাধিয়েছিলে? এ কয়দিনই তো কাজল সমানে রাত জাগচে...। চমৎকার মেয়ে· এদেরই কথা সেদিন তুই বলছিলি, না-রে?

পরাশর ক্লান্তস্বরে কহিল, হ্যাঁ মা।...একে তুমি দেখেও-চো অনেকবার! মনে নেই··· ?

মা কহিলেন, সেবা করতে পারে বটে এই মেয়ে, ঠায় বসে রাত জেগেছে। সুব্রতও এসে বসতো, কিন্তু বাড়ীতে তার স্ত্রীর অসুখ, কাজেই বেচারীকে চলে যেতে হত।···কাজল, আর একটু থাকো মা, আমি আসচি।...

মা পুত্রকে কথা কহিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নীচে নামিয়া গেলেন, কাজলের একখানি হাত দুই তপ্ত করতলে ধরিয়া পরাশর উচ্ছ্বসিত গলায় কহিল, কাজল, এত ভাল তুমি, তোমার এত গুণ,···তোমাকে আমি চিনতে পারি নি ..আমাকে ক্ষমা করো!

বার

কাজল কিন্তু সেদিন বুঝিতে পারে নাই যে উহা রোগশয্যার উচ্ছ্বসিত প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নহে। পরাশরের কথা কয়টি তার অন্তরের কোমল স্থানে গিয়া স্পর্শ করিতেই এক অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধিতে তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া কাজল বসিয়া-বসিয়া অনেক-ক্ষণ গল্প করিল। পরাশরকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার টিউসানী রহিয়াছে···ছাত্রী হয় তো এতক্ষণে সাজিয়া-গুজিয়া কোলের কাছে সেতারটী পাড়িয়া অপেক্ষা করিতেছে··· !

কর্ত্তব্যের আহ্বান, এ আহ্বানে তাহাকে সাড়া দিতেই হইবে এই দুর্দ্দিনে তাহার চাকুরীটী যাইলে সুব্রত বিপদে পড়িবে।···

··· ÷ ···

শরীরে একটু বল পাইতেই পরাশর নিজের গ্রামে কয়দিনের জন্য চলিয়া গেল।

চেনা গ্রাম, অথচ আজকাল তাহার রূপ কত, কত বদলাইয়া গিয়াছে।

বর্ষাকালে রাস্তাটার স্থানে স্থানে হাঁটু প্রমাণ জল জমিয়াছে, ঘোলা পাঁক-গোলা জল, দু ধারে কড় কড় করিয়া ব্যাঙ ডাকিতেছে·· যে দুইটী পুষ্করিণী আছে, তাহাও পানায় আচ্ছন্ন···। সবুজ ক্লেদাক্ত জল...মেয়েরা তাহাই, মানে পচা পাতা কলমীর

দল সরাইয়া কলসীর পর কলসী ডুবাইয়া জল লইয়া যাইতেছে...ওই জলই উহাদের একমাত্র ভরসা।...

পরাশরকে দেখিয়া প্রথমে ষ্টেশন মাষ্টার সুধাকর বাবুই কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ তো বাবা ?

পরাশর নমস্কারের ভঙ্গীতে যুক্ত-হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, আছি, খুব ভাল নয়, সম্প্রতি জ্বর থেকে উঠেছি...।

সুধাকর বাবু মাথা নাড়িয়া ব্যগ্র গলায় কহিলেন, তবেতো এসে ভাল করোনি, যে ম্যালেরিয়া · আর কি দেখচ দেশ আর সে দেশ নেই, শ্মশান হয়ে গেছে। সবাই একে একে কোলকাতায় সরে পড়েছে···শুধু আমাদের মত অভাগারা এখানে বাতি জ্বালিয়ে বসে রয়েছি যাও বাবা, রাত হ'য়ে আসছে · আলো দোব ?

পরাশর কহিল, আজ্ঞে কোন দরকার হবে না, আমার কাছে টর্চ্চ আছে।

সুধাকর বাবু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, দেখো বাবাজী···নালাগুলো একটু সাবধান হয়ে পার হোয়ো.. মা মনসার ভয় আছে...

পরাশরের গা যেন ছুলি-ছুলি করিয়া উঠিল···টর্চ্চের তীব্র আলো ফেলিতে ফেলিতে সে সাবধানে হাঁটিতে লাগিল। কাদায় পা ডুবিয়া গেল, পরাশর নিশ্বাস ফেলিল, এই পল্লীজননী অনাদৃতা পরিত্যক্তা মাতা···রাধু ময়রার দোকানে তখনও তেলের বাতিটা টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে, এখনও ঝাঁপ বন্ধ করিবার অবসর ঘটে নাই...।

...   .

রাধু ময়রার দোকানে তেলেভাজা বেগুনী হইতে এক পয়সা দামের চিনির গোল্লা সন্দেশ, ও ভাজা মুড়ী হইতে মাথার চিরুণী-কাঁটা-ফিতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। পরাশর পকেটে হাত দিয়া দেখিল মোমবাতি দুইটী সে ফেলিয়াই আসিয়াছে। পল্লীর এই বিজন অন্ধকারে অত বড় বাড়ীটায় সে রাত্রি কাটাইবে কি করিয়া··· !

পরাশরকে দেখিয়া রাধু বিগলিত অন্তরে অভ্যর্থনায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। ফোকলা মুখে এক গাল হাসিয়া কহিল, পথ ভুলে না কি দাদাবাবু?...রাজাবাবু, মা ঠাকরুণ, সব শরীল-গতিক সুস্থ আছেন তো?

পরাশর কহিল, সকলেই ভাল আছেন। তুমি দু'টো মোমবাতী আর একটা দেয়াশলাই দাও তো?

রাধু জিনিষ দুইটী বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া পরাশরের হাতে তুলিয়া দিল। পরাশরকে একখানি টুল আগাইয়া দিয়া গদ্ গদ স্বরে কহিল, একটু বসবেন না দাদা বাবু···ক'টারট্রেণে এলেন?

সাতটা বিয়াল্লিশের গাড়ীতে···এখানের খবর কি রাধু? আমি কিন্তু তোমাদের দেখতেই এলাম··· ।

রাধুর প্রদত্ত টুল খানি চাপিয়া পরাশর বসিয়া পড়িল। রাধু মুখ খানি শুষ্ক করিয়া কহিল, কি আর দেখবেন দাদাবাবু, কে আছে আর এখানে, সবাই এখানে ওখানে ছিট্‌কে পড়েছে...। তোমার সেই খেলা-ঘরের সাথী নন্তু...চৌধুরীদের বাড়ীর ছেলে

গো···পরশু রাত্তিরে গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেল···আহা দুটো পাশও না-কি করেছিল, বড্ড তেনার মুখ মিষ্টি ছিল···।

পরাশর সাশ্চর্য্যে কহিল, নলু? আমাদের নলু? সে আত্মহত্যা করলে? কি হয়ে ছিল রাধু?

ললাটে শীর্ণ হাত খানি ঠেকাইয়া রাধু কহিল, কপালের লেখন, চাকরী-চাকরী করে দুটি বচ্ছর ক-ত ঘোরাঘুরি করলে! তা পোড়া একটা অল্প মাইনেরও চাকরী জুট্‌লো না...পরশু সকালে ওর না কাকীমা নাকি খাবার সময় বড় মুখনাড়া দিয়েছিল···আহা আর সে সহ্যি করতে পাল্লে না দাদাবাবু···তেনার মার কান্না শুনলে বুক ফেটে যায়...।

পরাশর কথা বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না·· রাধু চোখ দুইটা মুছিয়া কহিল, ন, পাড়ার বোসেদের বাড়ীতে আগুণ লেগে সর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে। দেইজীদের আবাদ নিয়ে ঝগড়া···মাথা ফাটা ফাটি...হারু ঠাকুরের মেয়ে আজ সাত মাস নিউদ্দেশ, কত লোকে কত কথাই বলে · কি জানি, আমার কিন্তু বিশ্বেস হয় না, দাদাবাবু। সেবা দিদি আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে ছিল···আর দাদাবাবু তারা খুড়োর ছেলেরা না কি কপালে তেলক-ফোঁটা কেটে কোলকাতার রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়? কি জানি, তারা তো অনেক কাল অন্নের জ্বালায় ছন্ন হয়ে কোথায় পালিয়েছে...! রায় বাড়ীর তিনটে জোয়ান ছেলে স্বদেশী করে জেল খাটছে...তারা বলেছে তবু এখানে দু-বেলা দুটো খেতে পাব তো!...

শুনিতে শুনিতে পরাশরের চক্ষু দুইটা জ্বালা করে…কাণের দুইটা পাশ উত্তপ্ত হইয়া উঠে…

নিজের দেশে এত হাহাকার, এত দুঃখ দুর্দ্দশা…আর তাহারা কলিকাতা রাজধানীতে ফ্যানের নীচে শুইয়া প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছে। প্রেম কোথায়, স্বপ্ন দেখার অবসর কোথায়, মানুষের অন্তর যে শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া যাইতেছে। মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে চারিদিকের বাতাস ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতেছে…মানুষ আর সুখী, সহজ, আনন্দময় নহে…নির্জ্জীব অসহায় মানুষ প্রতি নিয়ত তাহাদের অদৃষ্টের জন্য বিধাতাকে অভিযোগ জানাইতেছে।

এই তো জীবন…তবু কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা ইহারই অন্তরালে বুঝি ঘুমাইয়া রহিয়াছে…তবু মানুষ আশা লতিকাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

বাহিরে আলোহীন অন্ধকার; নিকষ কৃষ্ণ রাত্রি গভীরতায় থম্ থম্ করিতেছে। পরাশর কহিল, কাল সব শুনবো, আজ অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে রাধু, উঠি।

রাধু কহিল, সঙ্গে যাব…দাদাবাবু?

—না, কোন দরকার নেই…সরকার মশাই, আর গোপাল বাবুকে তো বাড়ীতেই পাব…

রাধু সহসা পরাশরের ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল, পরাশর কহিল, কি রাধু? ফিস্ ফিস্ করিয়া রাধু কহিল, দোষ নেবেন না দাদাবাবু, নায়েব বাবু, ওই গোপাল নায়েবের জ্বালায় পাড়ার বৌ-ঝীরা

ঘাটে জল আনতে যাবার ভরসা পায় না।...রতন বাগ্দীর মেয়ে সুখি; আজকাল তার ঘরেই ওনার আসা যাওয়া···। আমি যে বললাম এ কথা যেন—

পরাশর কহিল, বুঝেছি রাধু, কোন ভয় নেই, এসে যখন পড়েছি, তখন এর একটা বিহিত না করে সহজে যাব না...

... ...

নিস্তব্ধ বাড়ীটায় পরাশর একা···সাতপুরুষের সাত মহল বাড়ী···এককালে যাহা আত্মীয় পরিজন, দাস দাসীতে গম্ গম্ করিত, নহবতখানায় প্রভাত ও সন্ধ্যায় সুমিষ্ট রাগিনী শোনা যাইত; সেই বাড়ী, সেই পুরী আজ জন মানব শূন্য, মানুষের অভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে।

বর্ষণ শীতল রাত্রিতেও পরাশরের ভাল করিয়া ঘুম আসে না, মনে হয় কাহারা যেন চকমিলানো বারান্দা দিয়া নিঃশব্দে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের পায়ের অতি লঘু শব্দ, অলঙ্কারের মৃদু শিঞ্জিনী পরাশর যেন স্পষ্ট শুনিতে পায়, পরাশরের প্রপিতামহর ঠাকুর্দ্দা না কি একাই বিশ জন লোকের মাথা লইতে পারিত...কত এমন ঘটিয়াও গিয়াছে···কত লুকানো রহিয়াছে হতভাগ্য অসহায়দের দেহ···নীচের চোর কুঠরীর পাশে, মাটীর তলায়। আজ তাহার চিহ্নমাত্রও হয়তো নাই...তবুও পরাশরের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় বড় তৈলচিত্রগুলির পানে চাহিয়া

যেন গা ছুলিয়া ওঠে, উহারাই তাহার পূর্ব্ব পুরুষ···পরাশর এই বংশেরই সন্তান···

··· ··· ···

রাত্রি প্রভাত হইলে পরাশর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল···পুকুরগুলা মজিয়া গিয়াছে, আগে ইহার সংস্কার আবশ্যক, তাহার পর রাস্তার এই হাঁটু-প্রমাণ পাঁক···ইহাও অবিলম্বে পরিস্কার না হইলে যে কয়টা লোক অবশিষ্ট ক্ষীরপুরে রহিয়াছে, তাহাদের আর চিহ্নমাত্রও রাহবে না। সব একে একে মৃত্যু দেবতার কবলে আত্ম সমর্পণ করিবে।

দিনের আলোয় পল্লীর কদর্য্যতা যেন আরও বেশী ··· চক্ষুকে পীড়া দিতেছে···

পরাশর মুখ হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল, পুকুর হইতে পানা তুলিবার জন্য লোক সংগ্রহ করিতে···আর একান্তই যদি কেহ এ কাজে যোগ না দেয়, তাহা হইলে সে নিজেই সাফ করিতে নামিবে···

সুদর্শন এত খাটিতে পারে, পরাশর কি এতটুকুও পারিবে না!...পরাশরকে দেখিয়া গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই ছুটিয়া আসিল। পরাশর তাহাদের গ্রামের সংস্কার করিতে আসিয়াছে, পরাশর এই শ্রীহীন গ্রামের রূপ ফিরাইয়া আনিবে...অন্য সর্ব গ্রামের মত তাহাদের গ্রামেও পাকা রাস্তা হইবে, নির্ম্মল পুষ্করিণীর

জলে তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িবে···গ্রামে হাঁসপাতাল, স্কুল লাইব্রেরী...

অসহায় মানুষরা চক্ষু চাহিয়াই আজ স্বপ্ন দেখিতেছে···পরাশর তাহাদের চক্ষে দেবদূত···

বুড়া হারু ঠাকুর কিন্তু এত সহজে স্বপ্ন দেখিবার পাত্র নয়, ওই কালেজী পড়া ছেলেগুলা তাঁর দুইটি চক্ষের বিষ···উহাদের ঝাঁঝ দেখিলেই নাক অমনি···উহারা কথা বেচিয়া খায়,উহাদের কথায় আবার প্রত্যয় করে···

মুখের উপর স্পষ্টই বলেন : কদিন এই কাজে ইচ্ছেটা থাকবে শুনি বাবাজী···তোমরা জমিদার, তোমরাই রইলে সহরে পড়ে··· গরীব প্রজাদের সুখ দুঃখ বুঝলে না···। দেশ যখন শ্মশান হয়ে এল, তখন এলে সংস্কার করতে... '

পরাশর কহিল, যেটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে প্রাণপণে তা গড়ে তুলতে চেষ্টা করবো···অবশ্য আপনাদেরও যোগ দিতে হবে বই কি, নইলে এ গ্রামের শ্রী ফিরিয়ে আনা আমার একার পক্ষে অসম্ভব...

হারু ঠাকুর ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া জবাব দেন, আমরা মুখ্যু মানুষ ভাই, আমাদের আশা করা বৃথা...হুঁঃ, তোমার বাবাই কত দেশের সংস্কার করলেন, তা তুমি করবে···। কিছুই হবে না, ও যে তিমিরে, সেই তিমিরে থেকে যাবে, যত কোদালই চালাও, আর জঙ্গল সাফ্ কর, পানা তোলো...দেশের মজ্জায় মজ্জায় যে অভাব

জড়িয়ে গেছে, সে শক্ত গিট খুলতে গেলে শক্তিমান লোক চাই...। এ তোমার আমার কাজ নয়, ভায়া ..

পরাশর কহিল, তাহলে আপনাদের কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না? হারু ঠাকুর, মুখুয্যে মশায়, চৌধুরী কাকা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন, তাঁহাদের সংসারে অনেক কাজ... ছেলেমানুষের ছেলেমী খেলায় তাঁহাদের যোগ দেওয়ার মত মূর্খামী আর দুইটী নাই...সুতরাং...

রাধু এতক্ষণ বড় বড় চোখে চাহিয়া ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল, হারু ঠাকুরের দল সরিয়া গেলে সে দোকান হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, দাদা বাবু...

পরাশর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, কি বলচ রাধু?

—দাদাবাবু ওঁদের কেন ডাকতে গেছেন, বলেন তো, আমি একাই ওই পানা তুলে ফেলতে পারি...ওদের কি মুরোদ আছে দাদাবাবু? খালি আস্ফালনই সার . আপনি একবার হুকুম দেন, দাদাবাবু ..

এই অশিক্ষিত সরল অন্তঃকরণ বৃদ্ধেরও হৃদয় বলিয়া বস্তু আছে...কিন্তু উহারা...

পরাশর কহিল, তোমার বয়স হয়েছে রাধু, নইলে তোমাকেই নিতাম, যাকগে আমি কোলকাতা থেকে লোক আনাবো...আচ্ছা রাধু, রেবতী কাকাদের বাড়ীটা এই ধারে ছিল না...?

সে বাড়ীতো গেল আশ্বিনের ঝড়ে ভূয়ে মূখে হয়ে পড়ে

গিয়েছিল...আহা সে বাড়ীর কি চিহ্ন আছে! দাদাবাবু, রেবতী জ্যাঠার মেয়ে, টুনু দিদির খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে, না? তেনার খবর জানেন?

পরাশর শূন্য ভূমিটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ভারী গলায় কহিল, জানি রাধু...তারা ভালই আছে...

পরাশরের অন্তর-দেশ আলোড়িত করিয়া ঝড় উঠে...সে ঝড়ের আঘাতে ওর বুক টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়—

টুনু, সত্যই কি তুমি সুখে আছ? না...

তেরো

উমার মন মেঘমুক্ত দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ওর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে যেন নবীন সূর্য্যালোক…

ছোট গাড়ীখানি লইয়া প্রায়ই উমাকে দেখা যায় দমদমে ছুটিতে। সুদর্শনকে দেখিয়া দেখিয়া তাহারও বিলাসে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, সিল্কের সাড়ী ব্লাউসে আর তাহার আসক্তি নাই… যদিও পুরাপুরি খদ্দর পরিতে তাহার মনের কোণে সঙ্কোচ জাগে …কিন্তু তবুও সাধা সিদা মিলের সাড়ী পরিতেই তাহাকে বেশীর ভাগ দেখা যায়…

সুদর্শনও উমাকে দেখিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠে…সুদর্শনের হাত হইতে কাজ কাড়িয়া লইয়া কাজ করিতে উমার আনন্দ হয়…।

এই আনন্দ যে কোন কেন্দ্র হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, উমা তাহা জানিয়াও জানে না…সুদর্শনকে একদিন না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না।

পরাশরের দুর্ব্বলতা সে জানিত, পরাশর যে তাহাকে কামনা করে উমা তাহাও বুঝিতে পারে, কিন্তু ভালবাসা জোর করিয়া আনা যায় না, পরাশরের উৎসুক চঞ্চল চোখে যে ছায়া পড়ে, উমা

তাহাকে সযত্নে এড়াইয়া চলে, এই চঞ্চলতা, এই দুর্ব্বলতা সব পুরুষের চোখেই সে দেখিতেছে, পরাশরও সেই দলের যে একজন নহে, এ কথা কে বলিতে পারে।

হইতে পারে, পরাশর হয়তো কৃত্রিমতা জানে না, পরাশরের দৃষ্টি তার অন্তরের সত্যটাকেই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে চাহে, কিন্তু এ রকম ভালবাসায় নিজেকে বিকাইয়া দিতে উমার সম্মতি নাই...যে অপরাজেয়, উমার প্রেম তাহাকেই ঘিরিয়া স্বপ্ন জাল রচনা করিতে চাহে !

সেই অপরাজেয় পুরুষটীর সন্ধান কি উমা এত দিনে পাইয়াছে ! সুদর্শন কিন্তু এত তত্ত্ব বুঝে না...কাজ-পাগ্‌লা মানুষ...কাজের ভিতরেই ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য কাহার জীবন-কমলের মুদিত দলগুলি একে একে বিকশিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, সে হিসাব সুদর্শন রাখে না...

সংসার না থাকিতেও সে সংসারের বাহিরে নূতন একটা সংসার পাতিয়া বসিয়াছে...সেই সংসারের আনন্দ লইয়াই সে বিভোর হইয়া আছে।...

... ...

দ্বিপ্রহরে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, বেহারী আসিয়া ডাকাডাকি করিলে সুদর্শন জবাব দেয়, তোমরা খেয়ে নাও না বেহারী...

বেহারী বলে, দিদিমণি কিন্তু রাগ করবেন...

সুদর্শন চমকাইয়া উঠেন, আজও তিনি আসিয়াছেন! উমা তাহাকে নিয়মের শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহে…উমা তাহাকে অভুক্ত থাকিয়া কাজ করিতে দিবে না…কিন্তু তাহার মত নীরস গৃহ-ছাড়া পুরুষের প্রতি এতটা মমতা কেন! কে বলিয়া দিবে!…উমার ব্যবহারে প্রতিমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।…

সুদর্শন উঠিয়া দাঁড়ায়…বাহিরে চুড়ীর মিষ্ট রিণিঝিণি আওয়াজ শোনা যাইবার পরেই উমার হাসি মুখখানি দেখা যায়। সুদর্শন মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, আবার এতটা পথ ছুটে এসেছেন?

একটি গতিহারা অলস মুহূর্তে..

যেন নিস্তব্ধ কোন একটী নদ..

সুদর্শনকে দেখিতে গিয়া উমার দুইটী গণ্ডে রক্তের ছোপ লাগে…সুদর্শন তাহাকে কি ভাবিতেছে কে জানে! কিন্তু সত্য, ও যখন অন্নের থালা সুমুখে রাখিয়া আহারের নিমিত্ত বসে…তখন একজনের শুষ্ক মুখ মনে পড়িয়া যায়…

অথচ সুদর্শন উমার কে? এত আপনার হইয়া উঠিল, কবে, কোন মুহূর্ত্ত হইতে!

জীবনের এক একটা অতি তুচ্ছতম ঘটনাও স্মৃতির পটে সোনার লিখনে আঁকা যায়…উমা এখন চায় প্রেম, সুদর্শনকে ভালবাসিয়া ও প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে শিখিয়াছে। কিন্তু উমা প্রগলভা নয়,

মনের গোপন কাহিনী ইচ্ছা করিলে সে আজীবন বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পারে…

কিন্তু আজ ওর দেহ যমুনায় জোয়ার আসিয়াছে…কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে ওর মন…সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে…

সুদর্শন কহিল, এই রোদ্দুরে…তেতে পুড়ে আসবার কি দরকার ছিল বলুন তো? আপনি তো জানেন না, এমনি কতদিন কত রাত আমার না খেয়ে কেটেছে…খাবার কথা মনেই জাগে নি…ও কি আপনার কি হল?

—কিছু না!

মুখ ফিরাইয়া উদ্গত অশ্রুর বেগ সংযত করিতে করিতে উমা কহিল, আর আসবো না · আপনার খাওয়া হোক না হোক, তাতে সত্যি আমারই বা কি ·

উমা—

সুদর্শন উমার চিবুক ধরিয়া সহসা মুখখানি তুলিয়া ধরিল, উমার মুদিত পক্ষের তলায় মুক্তার ন্যায় জল বিন্দু…উমার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

মুহূর্তে আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া সুদর্শন কহিল, আপনি কাঁদচেন?

– না কাঁদিনি…আপনার মত পুরুষ ..ছিঃ, যান্…

বলিতে বলিতে উমা বাহিরে গিয়া দাঁড়ায় · তার কপোল ভাসাইয়া অশ্রুর স্রোত নামিয়া আসিল।

অন্ধ সুদর্শন, নির্ব্বোধ সুদর্শন, উমা কেন আসে, সে-টুকু বুঝিবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে নাকি আবার—সত্যই, সুদর্শন উমার এই কান্নার হেতু খুঁজিয়া পায় না…

উমা এই কয়টা মাস আসা যাওয়া করিতেছে বটে, কিন্তু সুদর্শন মনে করে এটা মেয়েদের অন্তরের দাক্ষিণ্য ছাড়া আর কিছুই নহে…মেয়েরা সেবা করিতে…স্নেহ করিতে অদ্বিতীয়। এই জন্যই বলিতে ইচ্ছা করে "অন্নপূর্ণা, তোমার দ্বারে যুগে যুগে পুরুষ ভিক্ষা পাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইবে…তোমার এই দানের বুঝি তুলনা নাই…। এই জন্যই তোমরা আজও দেবী…তোমাদের স্নেহের মূল্য নিরূপণ করা পুরুষের সাধ্য নাই…

… … …

উমা কতক্ষণ পরে নিজেকে সম্বরণ করিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, সুদর্শন আসনের সুমুখে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে… খাবার ঢাকাটা এখনও পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই।

উমা মনে মনে ব্যথিত হইল, সরিয়া গিয়া কোমল মধুর কণ্ঠে কহিল, এ কী এখনও পর্য্যন্ত খেতে বসেন নি! কি ভাবছেন এত সুদর্শন বাবু?

সুদর্শন অপরাধীর মত শুষ্ক গলায় কহিল, আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন, উমা দেবী?

উমা বড় বড় চোখ তুলিয়া কহিল, তার মানে! ও সব ক্ষমা টমা আমি বুঝি না···আপনি আমার নাম ধরে ডাকবেন; ও রকম আপনি আপনি করলে ভীষণ রাগ করবো, নিন্, খেতে বসুন, বারে, আমাকে বুঝি ফিরতে হবে না?

সুদর্শনের বুক হইতে যেন পাষাণের স্তূপ নামিয়া গেল। অন্নের থালা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, নিজে নিজেই এত দিন রেঁধেছি · খেয়েছি, কিন্তু খাওয়াতে যে এতটা তৃপ্তি এ যেন ভুলেই গিয়েছিলাম, উমা, তুমি আবার স্মরণ করিয়ে দিলে!

চৌদ্দ

রাত্রে জ্যোৎস্নায় পথ ঘাট ভরিয়া গিয়াছে...মাঠের বুকে জ্যোৎস্নার রুপালী চাদর পাতা...মেঘ মুক্ত আকাশ যেন খুসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে...

পরাশর কাজলদহের হানার ধারে পায়চারী করিতেছিল। কলিকাতা হইতে মা বার বার ফিরিয়া যাইবার জন্য তাগাদ দিয়েছেন...তাছাড়া পল্লীর এই বৈচিত্র্যহীন জীবন আর পরাশরের ভাল লাগে না।

দিনগুলি যেন অসাড় স্পন্দনহীন...কোন কাজেই উৎসাহ জাগে না। কি করিয়াই বা জাগিবে, প্রথমে যে উদ্যমে ও কাজে লাগিয়াছিল, বাঁধা বটতলার যাত্রাপার্টীর ছোকরাদের ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া পুকুর সাফ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তাহার পর দেখা গেল, কাজের সময় সকলেই ফাঁকি দিয়া এ উহার স্কন্ধে কাজ চাপাইয়া সরিয়া পড়িতে চাহে ...জঙ্গল সাফ করিবার চাইতে আড্ডায় বসিয়া তাস খেলা ভাল।

জমিদারের ছেলে খেয়াল হইয়াছিল, তাই তাহারাও দুই একদিন কাজ করিয়া দেখিল...কিন্তু সাধ করিয়া ও সব ভূতের

ব্যাগার কে খাটিয়া মরে? ম্যালেরিয়া ও লিভার-পীলে তাহাদের কাছে পোষমানা ব্যাধি···সুতরাং উহা কাহারও কখন ক্ষতি করিতেছে না, তখন থাকুক না কেন? কি হইবে তাহাতে?

বর্ষায় "হানার" জল কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে, কূল ছাড়িয়া যেন উপছাইয়া পড়িতে চাহে···পরাশর চাহিয়া দেখে, ও যেন নদী নহে, দুরন্ত কলহাসিনী উমা, রূপের গৌরবে টলমল করিতেছে। কেতকীদের বাড়ীর উঠানে শ্যাওড়ার ঝোপ··· ফণী মনসার জঙ্গল···সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া পরাশর আরও বিহ্বল হইয়া পড়ে···ওইখানে সেই ছোট্ট মেয়েটী ডুরে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়াইয়া কাদা মাটীর ভাত রাঁধিত; কেতকীর হাতে পোঁতা বেলগাছটীর সর্ব্বাঙ্গ সাদা সাদা ফুলে ছাইয়া গিয়াছে,··

কিন্তু সে তো আর দেখিতে আসিতেছে না···এই গ্রামের সহিত চিরদিনের জন্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে···

হয় তো আর ফিরিবে না···না ফিরুক,···

··· ·· ···

এই গ্রামটীর অবস্থা ফিরাইবার জন্য পরাশর কত চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মনের ইচ্ছা মুকুলেই বিনষ্ট হইল। উচ্চ স্তরের লোকেরা তো এখানে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেই অনশন ও রোগ জর্জ্জরিত, তাহাদের কানে আশার অমোঘ বাণী শুনাইলেও তাহারা সহজে

বিশ্বাস করে না, প্রতি বৎসর অথচ বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে···তবু বুঝে না, নিরক্ষর চাষারা বুঝিয়াও বুঝে না···

ইহাদের জন্য আর দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ইহারা বাঁচিতে আসে নাই,মরিতেই আসিয়াছে, মরিবেও...অদৃষ্টের প্রতি তাহাদের অটল বিশ্বাস, অদৃষ্টে তাহাদের যদি এই ভাবে মৃত্যু লেখা থাকে, তাহা হইলে পরাশর কুচুরীপানা তুলিয়া, জঙ্গল সাফ্ করাইয়া কি-ই-বা করিবে, মৃত্যুকে সে দমন করিতে পারিবে? কত সহজে, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত লোকের আগ্রহ ব্যাকুল সজাগ দৃষ্টির সুমুখ দিয়া সে আপনার পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ বাধা দিতেও পারিবে না···

অমনি অদৃষ্ট বিশ্বাসী পরাশরও যদি হইতে পারিত···।

এইবার সে কলিকাতায় গিয়া উমাকে একবার স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, পরাশরের ধারণা সত্য কি-না...

কেতকীকে হারাণোর বেদনা একমাত্র উমাই উপশম করিতে পারে, অমনি একটী প্রাণময়ী সজীব সঙ্গিনীই তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে...উমাকে যদি পায়, তাহা হইলে পরাশর হয় তো কেতকীর শোক ভুলিতে পারে...কিন্তু উমা যদি বাঁকিয়া বসে··· !

বাম হাতে লণ্ঠন ও কোঁচা ধরিয়া মুখুয্যে মশাই দাবা খেলিয়া

ঘরে ফিরিতেছিলেন…পরাশরকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি সাড়া লইলেন, কে রে ওখানে?

পরাশর কহিল, আমি মুখুয্যে মশায়…আমি পরাশর…

ও, তা নদীর ধারে বেড়াচ্ছ কেন বাবা, বাড়ীতে বুঝি আর মন টিকছে না? এই বন জঙ্গলে…তাতে আবার এ বছর পচা বর্ষা নেমেছে…হ্যাঁহে শুনলুম তুমি আর এ সব কিছু করবে না, তার পর তুমি নাকি বাড়ী চলে যাচ্ছ?

পরাশর কহিল, সত্যি…! মিথ্যে এখানে বসে থেকে তো কোনও লাভ নেই…কি করবো বলুন?

মুখুয্যে মশায় কহিলেন, ওরা সব বলাবলি কর্চ্ছিল যে পরাশর শেষ পর্য্যন্ত কাজ করে উঠতে পাল্লে না, পল্লী সংস্কার কি চারটী খানি কথা!

পরাশরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, ওরা মানে, কারা?

ওই হারু ঠাকুরের দল · তুমি ওদের চেনো না, উপকার করলেও ওরা সেই উপকারের অপযশ গেয়ে বেড়ায়…এই যে তোমার দৌলতে পুকুরটা পরিষ্কার হল…গাঁয়ে একটা স্কুল বসলো, আবার হাঁসপাতালের জন্যে লেখালেখি করছ, ভাল পাশকরা ডাক্তার আর ধাত্রী মাইনে দিয়ে কোলকাতা থেকে আনাচ্ছ, এগুলো কি কিছু নয়? হিংসে বাবাজী, ওদের সব হিংসে

তুমি পাশ করেছ, সরকারের চাকরী পেয়েছ, ওদের গণ্ডা গোণ্ডা ছেলে ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতে বুক ফাটবে না, কি বল

বলিবে কি, এ সব কথা শুনিতে শুনিতে পরাশরের চিত্ত ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল...

সেই দলাদলি, সেই হিংসা দ্বেষ···না, পরাশর আর ইহাদের জন্য কিছু করিবে না···

এত হীন মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত...দুঃখ হয় ইহাদের কথা ভাবিতেও...

কূপের মধ্যে চিরদিন মুখ গুঁজিয়া থাকিয়া অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে···তাই সাগরের অতলতার আভাস পাইয়াই ইহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

... ...

রাধু সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছে···ওর মনে হিংসাও নাই, কপটতাও নাই···দিল খোলা দরাজ বৃদ্ধ...বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, নির্ম্মল নিষ্পাপ চিত্ত...

পরাশর গৃহে ফিরিতে ফিরিতে আকাশের দিকে তাকাইল, অনন্ত উদার মহাকাশ...উহাকে চিনিয়াছে পরাশর, এখনকার ওই নীল নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশের মত চিত্ত তাহার ভাবনা শূন্য হয় না কেন, তাহা হইলে পরাশর তো এই মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া যাইত।···

... ...

কলিকাতায় পৌঁছাইয়া সর্ব্বাগ্রে পরাশর উমার সন্ধানে ছুটিল।

কিন্তু উমা কই! উমার শূন্য ঘরখানা তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিতে লাগিল। উমার টেবিলে দুইটা সুন্দর ভাসে শুষ্ক দুইটা ফুলের তোড়া…মেজের ম্যাটীংএ প্রচুর ধূলা জমিয়াছে…ফোটো-গুলির কাঁচাবরণও ঝকঝকে পরিষ্কার নহে, সেলাইএর কলটা একধারে অযত্ন সহকারে খোলাই পড়িয়া রহিয়াছে…সারা ঘর-খানিতে কাহার উৎক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল চিত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়…

পরাশর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে দমদমায় সুদর্শনের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে, এমনি সে রোজই একবার করিয়া দমদমে যায়…

পরাশর ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ওঃ…আচ্ছা আসি, আমি যে এসেছিলাম, তাকে জানাবেন…

উমার বিষয় চিন্তা করিতেও পরাশরের আর প্রবৃত্তি হইল না, মেয়েদের প্রেম এত চীপ…সস্তা দরে তাহারা একটী কথায় বিকাইয়া যায়,…

উমা, উমা, তোমার উপর পরাশরের যে শ্রদ্ধা ছিল, আজ তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে চির দিবসের মতই…তুমি না বলিয়াছিলে ভাল বাসিবার মত পুরুষ এখনও খুজিয়া পাই নাই…

সুদর্শনকে কি তোমার এত বেশী ভাল লাগিয়াছে...যে পরাশরের এতখানি প্রেম তুমি স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিলে...

পরাশর উমার টেবিলে বসিয়া দ্রুত হাতে একখানি রাইটিং প্যাডের পুরু পাতা ছিঁড়িয়া খস্ খস্ করিয়া লিখিতে বসিল,

উমা,

এখানে এসে তোমার দেখা পেলাম না···তোমার শূন্য ঘরটা আমাকে নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে তোমার ঘরের প্রতি প্রচুর ঔদাস্য! তোমার এই পরিবর্ত্তনটুকু হ'ল কবে থেকে—জানতে পারি কি? আমার আসা আর সম্ভব হবে না, যদি ওখানে দয়া করে যাও তো কৃতার্থ হ'ব···

পরাশর...

কাঁচের সুদৃশ্য পেপার ওয়েট দিয়া চিঠিখানি চার-ভাঁজ করিয়া টেবিলে চাপা দিয়া রাখিয়া পরাশর উঠিল। উমার এই ঘরখানা তাহাকে সত্যই বড় ক্লেশ দিতেছে...এই ঘরে বসিয়া একদিন সে উমার সহিত কত তুচ্ছ কথা লইয়া মান-অভিমান করিয়াছে, আর হৃদয়হীনা উমা তাহার রোগ শয্যার পাশে গিয়াও একবার দাঁড়াইতে পারিল না!

পনেরো

কয়দিন উমার প্রতীক্ষা করিল পরাশর, কিন্তু উমার দর্শন পাওয়া গেল না। মধ্যে একদিন কাজল আসিয়াছিল, কাজলের সেই টিউশানীটুকু যাহা হইতে সুব্রত বাড়ীভাড়া ও দোকানের দেনা পরিশোধ করিত, সেই চাকরীটুকুও ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন। কাজলের শুষ্ক মুখ দেখিয়া পরাশর অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়াছিল।

পরাশর আশ্বাস দিয়া কহিয়াছে: চাকরী তাহাকে একটা খুঁজিয়া দিবে, কাজল যেন না ভাবে...

সুব্রত ওর স্ত্রীকে যাদবপুর হাঁসপাতালে দিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে তাহারা রোগিণীকে ভর্ত্তি করে নাই...

সুব্রত'র পত্নী এই অসুস্থাবস্থায়ও নাকি সন্তান সম্ভবিতা... চমৎকার···মানুষকে পৃথিবীতে আনিতে কেন মাশুলের ব্যবস্থা হয় নাই; অন্ততঃ করা উচিত··তাহা হইলে হয় তো এই অস্বাভাবিক জন্মের হারটা কিছু প্রশমিত হইত...কিন্তু···

সুব্রত না কি কাজলের বিবাহের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, যদি কেহ বিনাপণে তাহার এই ভগ্নীটিকে গ্রহণ

করে…। সুব্রত একাই মরিতেছে মরুক, কাজলটাকে আর সেই মৃত্যুর বন্ধনীতে জড়াইতে াহে না…

সুব্রত শেষ পর্য্যন্ত কাজলের মায়া কাটাইতে চাহে…ছোট অপগণ্ড শিশু কয়টাকে ওর মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেই চলিবে··

তারপর সুব্রত'র সুমুখে দীর্ঘপথ ..সে পথের পথিক সুব্রত, একা একা পাড়ি দিবে…তখন আর সুব্রত'র নাগাল পায় কে ?

. পরাশরের বৈঠকখানায় বসিয়া সুব্রত সেদিন কত কথাই কহিয়া গিয়াছে, আজকাল এইভাবে ও অনর্গল বকিয়া যায়, বকিয়া, প্রচুর কথা কহিয়া ও তৃপ্তি পায়…

সত্য, ওর দুঃখের সীমা নাই, সাগরের মত দিক্ চিহ্নহীন অপার বিস্তৃত…

চৌধুরীদের নলু, ভাল ছেলে হইয়াও আত্মহত্যা করিল, নিজের অমূল্য জীবনটার কথা একবার ভাবিল না, ভাবিয়াছিল শুধু বেকার অবস্থায় কতদিন পরের গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইবে।

অনেকে বলিে নলু কাপুরুষ…কিন্তু পরাশর জানে নলু কাপুরুষ নহে, দিনের পর দিন অন্নের চিন্তা করিতে করিতে মাথার স্নায়ুগুলা বিকল হইয়া যায়, ইহা তো স্বাভাবিক…

… … … …

জর্দ্দার কৌটা ও পানের ডিবা হাতে লইয়া মা আসিয়া বসিলেন। কয়দিন ধরিয়া বৃষ্টির অত্যাচারটা একটু কমিয়াছে…

খোলা জানালা দিয়া চওড়া রাস্তাটা দেখা যাইতেছে···কত বিচিত্র লোকের আনাগোনা তাহার বুকে...কত মোটর রিক্সা ও সাইকেল আসা যাওয়া করিতেছে···পরাশর সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়াছিল। মা হাসিয়া কহিলেন, হ্যাঁরে প্রিয়, কর্ত্তার ঘরে আর যাস না কেন বল্ তো?

পরাশর শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, কেন মা, বাবা তার জন্যে কিছু বল্‌ছিলেন?

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, এমন কিছু নয়, জিগ্যেস কর্চ্ছিলেন, তোর চাকরীর কী হল?

পরাশর খাটের উপর সোজা হইয়া বসিয়া নিম্নস্বরে কহিল, চাকরী পাইনি মা, চাকরী আমি করবোও না, যদি করি তো কোনও ব্যবসা করব।

মার হাসিতে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কৌটা হইতে এতটুকু জর্দ্দা তুলিয়া গালে ফেলিয়া মা কহিলেন, ও-রে পাগ্লা, চাকরীর কথা বলবার উদ্দেশ্য, তুই সেদিন বলেছিলি না, যে চাকরী না পেলে বিয়ে করবো না, তাই···নইলে তোর চাকরীর অপেক্ষায় কে বসে আছে?

পরাশরের মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল: তোমরা আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না মা; বলেচি তো, বিয়ে আমি এখন ক'রবো না...

মা একটু স্নেহের সহিত আবদার মিশাইয়া কহিলেন, লক্ষ্মীটি, বাবা অমত করিস্ না, কর্ত্তা সেদিন বাগবাজারে একটী সুন্দর মেয়ে দেখে এসেচেন, দেখবি তার ফটো··· ? এই ছাখ, যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা···টুনু এর ধার দিয়েও যায় না···হুঁঃ কিসে আর কিসের সঙ্গে তুলনা !

চারকোণা একখানি মাঝারী সাইজের ফোটোগ্রাফ মা ধীরে ধীরে অঞ্চলের তলদেশ হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপরে রাখিলেন···

পরাশর ঘুরিয়া বসিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিত্রের উপর চক্ষু পড়িল, হ্যাঁ, সুন্দর বলিয়া মেয়েটী গর্ব্ব করিতে পারে···চমৎকার শ্রী· অপরূপ লাবণ্যবতী উমার রূপও বুঝি ইহার কাছে মলিন হইয়া যায়···

কিন্তু কেতকীকে পায় নাই বলিয়া সেই দুঃখ তাহাকে ভুলিতে হইবে, অপর একটী সুন্দরী নারীকে লইয়া···

যাহাকে কোনদিন দেখিল না, চিনিল না পর্য্যন্ত···সেই শেষে পরাশরের গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবে। তা ছাড়া পরাশরের রূপের ক্ষোভই না হয় মিটিল, কিন্তু তাহার বুভুক্ষু অন্তর ..

কেতকীর পরেই সে চাহিয়াছিল উমাকে, অবশ্য এ চাওয়ার কাহিনী জানে শুধু উমাই···এ রহস্য অন্য সকলের কাছে অজ্ঞাত··· উমা, সেই উমাও যখন তাহার কাছে দুষ্প্রাপ্য···তখন আর

কাহারও সৌন্দর্য্য দিয়া সে অন্তরের এই দৈন্যতাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায় না…

বিবাহই যদি করিতে হয়. সংসার করিতে গেলে জীবনে যদি স্ত্রীই হন অপরিহার্য্য…তাহা হইলে ও সৌন্দর্য্যের প্রত্যাশা করে না পরাশর, একটা জোড়া স্নিগ্ধ কালো আঁখি ..দুইখানি সেবায় নিপুণ হাত, ও একটী প্রেমে ভরপুর পবিত্র হৃদয়, পরাশর ইহার বেশী কিছু প্রার্থনা করে না।

ফটোখানি মার হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এত সৌন্দর্য্য গেরস্ত ঘরে মানায় না মা, দোকানের শো কেসে সাজিয়ে রাখাই ভালো…

এক দৃষ্টে পরাশরের পানে তাকাইয়া মা কহিলেন, তোর মতলব কি বলতো প্রিয়, সত্যই কি সংসার পাতবি না…

না মা…সংসারের রূপ দেখে সংসারে ইচ্ছা নেই…ওই সুন্দর মেয়েটীকে এনে সংসারের চাপে দু'দিনে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করে না…তার চেয়ে এ বেশ আছি মা… কোন দুঃখ কষ্ট নেই… কেমন খাচ্ছি আর বেড়াচ্ছি বল তো ?

মা একটু রাগের সহিত কহিলেন, তা সেই মেয়েটী ঘরে এলে কি তোর বেড়ানো আর খাওয়া দাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটবে ? কি যে বলিস প্রিয়, তার ঠিক নেই…যাক গে তোদের যা ভাল হয় কর…আমি আর কিছু বলবো না…

মা উঠিয়া গেলেন। পরাশর উঠিয়া ঘরময় পায়চারা করিতে লাগিল, বিবাহ, সংসার-দারিদ্র্য…যেন পাশাপাশি তিনটী ভাই…একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না…। অবশ্য দারিদ্র্য তাহার নাও আসিতে পারে; তাহার যে আয় আছে তাহাদের দিনগুলি হয়তো স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইবে…

কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যখন অনাহৃত অতিথিগুলি একে একে শুভাগমন করিবে…

তা ছাড়া, কেতকীর স্থানে আর একজন…

পরাশর তাহা কল্পনাও করিতে পারে না…

… … … …

পুষ্পসারের একটা ক্ষীণ মৃদু গন্ধ…পরাশর সচকিত হইয়া টেবিল হইতে মাথা তুলিল…

উমা… !

উমা এ কয়দিনে বড় বেশী শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে…

উহাকে আর চেনা যায় না…

বসো উমা,…ইস্ এত রোগা হয়ে গেছ কেন?

পরাশর করুণায় বিগলিত হইয়া প্রশ্ন করিল…।

উমা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, কতক্ষণ চুপচাপ, নিঃশব্দেই মুহূর্ত্তগুলি কালের সাগরে সাঁত্‌রাইয়া পার হইয়া যাইতেছে।

মুখ তুলিয়া ভারী গলায় উমা কহিল, আমার ওপর রাগ করেছ তুমি ?

পরাশর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল. না, রাগ করিনি উমা...বড় দুঃখ হয়েছিল, তাই।..

কিন্তু মনে হচ্ছে আমার তুমি রাগই করেছ; পরাশর, আমি তোমার যদি ছোট বোন হতাম. তাহলে কি তুমি আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারতে ?

উমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া উঠিয়াছে।

পরাশর সন্ত্রস্ত গলায় কহিল, তুমি কি বলছ উমা...তোমার সঙ্গে কী নিষ্ঠুর ববহার করেছি বলতো ? শুধু শুধু আমার নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছ কেন ?

উমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, পরাশরের কথায় সে মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, তবে তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন ?

কি করতে যাব উমা, সত্যিই বল দেখি, তুমি কি সেই আগের মত উমাই আছ, না তোমার অন্তরে বাহিরে নব পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে...সুরু হয়েছে ভাঙ্গনের দশা...

উমা নত মুখে কহিল, সব জিনিষেরই তো পরিবর্ত্তন আছে, পরাশর আমিও মানুষ...

হ্যাঁ, মানুষ যে তুমি এ টুকু আগে স্বীকার করলেই পারতে ..

কেন তবে অত অহঙ্কার করেছিলে? যদি না করতে. তাহলে—তাহলে হয়তো—

পরাশরের গলা ধরিয়া আসিল। প্রকাশের আবেগে কণ্ঠের স্বর কাঁপিতে লাগিল...

ত্রস্ত গলায় উমা ক'হল, মানুষের মনের ওপর হাত নেই পরাশর, নইলে সত্যই আমি এতটা বদ্‌লিয়ে গেলাম কি করে ভেবে পাই না...তুমি আমাকে ক্ষমা করো পরাশর, তোমাকে আমি সত্যই দুঃখ দিয়েছি...আজ বুঝেছি সব, আমাকে,—

উমার চোখের জল এইবার পরাশরের সুমুখে আত্ম প্রকাশ করিয়া বসিল। উমাকে কাঁদিতে দেখয়া পরাশর মনে মনে বিচলিত হইলেও মুখে কিছুই বলিল না ..অন্তরে যে ঈর্ষার মেঘ তিমিরান্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে সহানুভূতির আলো কোথায়?

পরাশর কহিল, সুদর্শনের খবর কি? কেমন আছে সে, তার কাজ চলচে কেমন, ভালো তো?

উমা শাড়ীর পাড় ধরিয়া টানিতে টানিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভালই আছেন, সন্ন্যাসী মানুষ...কোন দুঃখ বালাই নেই, নির্বিকার আত্ম-সমাহিত...এক এক দিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন...

পরাশর কহিল, তুমি উমা, এতদিনেও তার তপস্যা ভাঙ্গতে

পারলে না? আমি কোথায় ভাবছিলাম যে সুদর্শনের উদাসী মন এবার উমার পদ প্রান্তে আত্ম সমর্পণ করেছে···

উমার মুখে চোখে লজ্জায় অরুণাভা দেখা দিল, কম্পিত গলায় সে কহিল, তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটানো বড় সহজ ব্যাপার নয় পরাশর, এ জন্মে তিনি ভাল হয়তো কাউকেই বাসতে পারবেন না···তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির অসন্মান তিনি না কি বেঁচে থাকতে ঘটতে দেবেন না···এ কথা আমি সুদর্শন বাবুর মুখেই শুনেছি।···

পরাশর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া কহিল, কিন্তু তোমার এই সর্ব্বস্ব উজাড় করা শ্রদ্ধা, এ-ও কি সুদর্শনের কাম্য নয় উমা?

উমা গাঢ় স্বরে কহিল, না, তাঁর সংযত মনের পরিচয় যে পেয়েছে সেই জানে, যে সুদর্শন বাবুর মন শিশুর মত নরম, আবার পাথরের মত কঠিন, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা আর একাগ্রতা, প্রশংসার যোগ্য...আমি তো তুচ্ছ হতেও তুচ্ছতর পরাশর, আমার সাধ্য কতটুকু···যে ওঁকে আমি সাধারণ মানুষের মত সুখে দুঃখে কাছে পাব···আমিও এ জন্মে তপস্যা সুরু করে দি-ই, দেখি পরজন্মে যদি ওঁর ধ্যান ভাঙ্গাতে পারি...

অশ্রুর অনির্ব্বচনীয় আবেগে উমার কণ্ঠস্বর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল···পরাশর মুগ্ধ দৃষ্টিতে উমার সকরুণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দর্পিতার সকল অহঙ্কার, সকল গর্ব্ব এইবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে …ভালবাসাকে যে সস্তা হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা বলিয়া ব্যঙ্গ করিত সেই বিশ্বজয়ী ভালবাসা উহাকে স্বর্ণময় শৃঙ্খলের পাকে পাকে জড়াইয়াছে। উমা বুঝিয়াছে ভালবাসায় কত বেদনা, আবার কত মধুরতম আনন্দ…

সে পরাশরকে এই আনন্দের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে… আজ পরাশরের জন্য তাহার প্রাণে মমতা জাগে।…পরাশর যদিও মুখ ফুটিয়া তাহার কাছে প্রার্থনা জানায় নাই, কিন্তু উমা তো কচি-মেয়ে নহে…উমা যে সব জানিত, বুঝিত…

ষোলো

উমার উপর পরাশরের আর রাগ নাই, পরাশর ওর বেদনায় সমব্যথী...

কোথায় একটা অস্থায়ী কাজ পাইয়াছে কাজল; ফিরিবার পথে পরাশরের বাড়ী আসিয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পরাশর আসিয়া পড়ায় কাজলের আর ফিরিয়া যাওয়া হইল না। পরাশর কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ফিরে যাচ্ছিলে যে বড় ?

কাজল অস্পষ্ট স্বরে কহিল, কি জানি, কেমন যেন মনে হল, আপনি নেই...আজ আমি একটা নতুন কাজ পেয়েছি···

—কাজ ! কোথায় কাজল

—কাছেই, তবে খাটুনী একটু বেশী···এইমাত্র ফিরছি, বেরিয়েছি সেই তিন টেয়···দাদার কদিন ধরে জ্বর হয়েছে শুনেছেন, আর আমাদের সেই বাচ্চাটা ?

কাজল, কি হয়েছে তার বল, তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে দেখছি !

কাজল অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, চোখে বুঝি জল আসিয়াছিল, তাই পরাশর যাহাতে সে অশ্রুর আভাসও না দেখিতে পায়, সেই কারণে···

সেই ছোট্ট খোকাটুকু, মরে গিয়ে বেঁচেছে···বৌদিদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠেছে···

পরাশর বিহ্বল গলায় কহিল, সুব্রতর জ্বর...তাহলে সুব্রতও আর বাঁচবে না···অভাবের তাড়নায় সবাই প্রাণ দিলে, কাজল, তোমার শরীর সুস্থ আছে তো? জ্বর টর হয় না—

কাজল ক্ষীণ ভাবে হাসিল; তাহলে তো বাঁচতুম পরাশর বাবু, অন্ততঃ দাদার মরণও একটু সুখের হ'ত, নির্ভাবনায় মরতেন, কিন্তু আমাকেও হাঁসপাতালে দেখানো হয়েছে···দাদার ভয় ছিল, পাছে আমাকেও ওই রোগে ধরে!

ডাক্তার বলেছেন আমার শরীর নাকি খুব সুস্থ আছে। পরাশর যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাজলের একখানি হাত সযত্নে হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কাজল, তুমি ভেব না, তোমাকে আমি কিন্তু মরতে দেব না, তোমাকে বাঁচাবো...আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে, এস আমার ঘরে এস...

পরাশরের পিছনে পিছনে কাজল নত মুখে ভিতরে ঢুকিল। পরাশরের কথার ভঙ্গীতে তার অন্তর নূতন ভাবে নূতন রসে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, পরাশর তাহাকে বাঁচাইতে চায়, তার প্রাণের মূল্য পরাশরের কাছে কি এতই বেশী···

ঘরের ভিতরে কাজলকে বসাইয়া পরাশর ড্রয়ার টানিয়া এক গোছা নোট বাহির করিয়া কহিল, চল কাজল, তোমাদের বাড়ী

চল তো···দেখি তোমার দাদার কি হয়েছে ··ইস্, কদিন আগেও যদি আমাকে জানাতে—

কাজল নম্র গলায় কহিল, কিন্তু ও বাড়ীতে আপনাকে যেতে দিতে পারি না, না সেখানে আপনি যেতে পাবেন না···

পরাশর দৃঢ় গলায় আপত্তি করিয়া কহিল, কেন কাজল বাধা দিচ্ছ, বন্ধুর বিপদে আমাকে যদি তুমি এতটুকুও সাহায্য করতে না দাও, তাহলে মনে করবো তুমি আমাকে নিতান্তই পরের চোখে দেখ...

... ...

পরাশর তাহাদের ফ্যামিলী ডাক্তার মেজর এস্ কে স্যান্নালকে সঙ্গে করিয়া যখন স্থব্রতর বাড়ী পৌঁছাইল, তখন দেখিল, রুগ্ন স্থব্রত শীলা'র বুকের উপর মাথা রাখিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে ···কঙ্কাল সার দেহ. ওরও কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই...বুকের এক একখানি পাঁজর যেন গোণা যাইতেছে ;

পরাশর সেই দৃশ্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না··· তাহার পা দুইখানি যেন প্রেক দিয়া কে আঁটিয়া দিয়াছে।

... ...

সব আয়োজনই বৃথা হইল···শীলাকে ফিরাইতে পারা গেল না...পরাশর অজস্র অর্থ ব্যয় করিল, কিন্তু শীলা আর উঠিল না...। ছোট খোকাটী পূর্ব্বেই গিয়াছিল, বড় মেয়েটীও অকস্মাৎ

হাম জ্বরে মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করিল…সুব্রত আর কাজল, অবশিষ্ট দুইটী সন্তানকে লইয়া অন্য বাসাতে উঠিয়া আসিল।

পরাশরের এইবার অর্থের প্রচুর প্রয়োজন হইতে লাগিল; সুব্রত এখনও সারিয়া উঠে নাই, কাজল কয়দিন অনুপস্থিত থাকিয়া একদিন ছাত্রীর বাড়ী গিয়া দেখিল তাহার স্থানে নূতন লোক আসিয়াছে। ছাত্রীর মাতা মুখের উপরেই বলিয়া দিলেন, পয়সা দিয়া তাঁহারা লোক রাখিয়াছেন কাজ করিতে, মুখ দেখিয়া তৃপ্ত হইবার নিমিত্ত নয়…

প্রতিবাদ করিতে কাজল কোনও দিন শিখে নাই, আজও করিতে পারিল না, বলিতে পারিল না যে 'ওই কয়টা টাকার মূল্য আপনারা কি বুঝিবেন! ঐশ্বর্য্যের শিখরে বসিয়া দরিদ্রের দুঃখময় জীবনের ইতিহাস শুনিবার মত তাঁহাদের প্রচুর অবসর নাই। কাজল বিনা বাক্যব্যয়ে কয়টী টাকা হাত পাতিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল।

পরাশরের টাকা লইতে তাহার কোনদিনই ইচ্ছা ছিল না… যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিবার মত লজ্জা আর নাই; কাজল মরমে মরিয়া যাইত…

রাত্রে সুব্রতর শিয়রে বসিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পড়িতে এক এক সময় স্তব্ধ হইয়া ভাবিত, তাহাদের এই বিপদের কি শেষ নাই। স্রোতের মুখে তুচ্ছ তৃণদল ভাসিয়াই চলিতেছে…কূল

মিলিবে কবে, কবে তাহাদের দুঃখময় দিনগুলি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শুধু কাজলই অন্ধকারময়ী রাত্রির দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের কল্পনায় আশা নিরাশায় আত্মহারা হইয়া উঠে, না · পৃথিবীর দিকে দিকে এই আশা নিরাশা...রোমে রোমে এই আর্ত্তনাদ নিশিদিন অবিরাম ধ্বনিতে আবর্ত্তিত হইতেছে...পৃথিবী আর রঙে রসে বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ভরপুর নহে, মৃত অচেতন...

... ...

কালের গতির সহিত মানুষের মনও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরাশর এখানে প্রত্যহ আসা যাওয়া করে, সুব্রত'র শয্যাপার্শ্বে উভয়ে একত্রে কত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে ...। সন্ধ্যায় টেবিলের সুমুখে বসিয়া কাজল সুর করিয়া ব্রাউনিং পড়িয়া ওর দাদাকে শোনায়। পরাশর মুগ্ধনেত্রে কাজলের শ্যামল, শোভন মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে...

পরাশর আর একা একা নিজেকে বহন করিতে পারে না, এমনি একটি সেবা পরায়ণা নারীর সঙ্গলাভ করিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, কাজলই তাহার অন্তরের বেদনা দুইখানি স্নিগ্ধ-সুশীতল করতল দিয়া মুছিয়া লইতে পারিবে।...

কিন্তু কি করিয়া উহাকে বলা যায়, কাজল যদি ভাবে, দুঃখী

দেখিয়া, অসহায় ভাবিয়া পরাশর উহাকে অন্তরের দাক্ষিণ্যে ভুলাইতে চাহিতেছে, নহিলে কাজলের প্রতি তাহার এই মনোভাব প্রেম নহে, কারুণ্য, শুধু অনুকম্পা মিশানো কারুণ্য…

দিশাহারা পরাশর ভাবনার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না!

সতেরো

বাহিরে বসিবার ঘরের পর্দা ঠেলিয়া সুদর্শনকে দেখিয়া পরাশর আনন্দে বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল ; তুমি ! কখন এলে··· ভাল আছ তো ?

সুদর্শন পরাশরের হাতে হাত রাখিয়া মৃদু স্বরে কহিল, ভালই আছি···কোলকাতায় কিছু কেনবার জন্যে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম তোমাদের একবার দেখে যাই। অনেকদিনের পুরোণো সাথী তোমরা, তোমরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারিনি।

পরাশর ঈষৎ ব্যথিত গলায় কহিল, ও কথা বলো না সুদর্শনদা, ভুলতে কেউ কাউকেই পারে না···তবে তুমিতো আর কাছাকাছি থাকো না, তোমার বাড়ীঘর ছাত্রদের নিয়ে আলাদা সংসার পেতে বসে আছ, তোমারই নাগাল পাওয়া ভার··

সুদর্শন ভারী গলায় কহিল, আর ভালো লাগে না পরাশর, এক এক সময় মনে হয় সব ফেলে রেখে কোনও দূর দেশে চলে যাই...কিন্তু ওই কতকগুলো অপগণ্ড, ওদের কারুর মা নেই, কারুর বাপ নেই...কারুর বা পরিচয়ই নেই···ওদের সঙ্গে মায়ার

বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছি ভাই, আমার কোথায়ও গিয়ে নিশ্চিন্ত হবারও উপায় নেই।"

পরাশর টেবিলের উপর হাত রাখিয়া গম্ভীর গলায় কহিল, ইচ্ছে করে কষ্ট পাও কেন সুদর্শনদা, যিনি গেছেন সহস্র চেষ্টাতেও তাঁকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তবে তাঁর জন্যে তোমার আর এক জনের মনে ব্যথা দেওয়া উচিত হয় না…

সুদর্শন চেয়ারটা লইয়া ঘুরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, কার মনে ব্যথা দিচ্ছি আমি, কিছু বুঝলাম না পরাশর…

সুদর্শনের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল…চোখের দৃষ্টি প্রশ্নের প্রখরতায় উন্মুখ হইয়া উঠিল -

হাতের খাতাখানি মোচড়াইতে মোচড়াইতে পরাশর বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, উমাকে কি এতদিনে চিনেও চেননি সুদর্শনদা, উমার মত মেয়ে—

উমা!

সুদর্শন কথাটী উচ্চারণ করিয়াই দুই হাতে কপালের দুইটী পাশ টিপিয়া ধরিল। ঠিক! ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ পরাশর, উমার মধ্যে আমিও একটা পরিবর্ত্তনের সাড়া পেয়েছি…। কিন্তু আমি উমার এই ভালবাসার প্রতিদানে কি দেব পরাশর, একজনকে যা দেবার সবই দিয়েছি, শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়…কেন ওকে জীবনের সাথে জড়িয়ে কষ্ট দেব…পরাশর তুমি উমাকে একটু বুঝিয়ে

ব'লো, ব'লো যে সুদর্শনের কোন উপায় নেই, থাকলে সে—এ অমূল্য দান মাথা পেতে গ্রহণ করত।

পরাশর হাসিয়া উঠিল, সুদর্শনের চিন্তা ক্লিষ্ট মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, ভুল করছ এইখানেই সুদর্শন'দা, এ সব কথা মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া যায় না···ওরা ভালবাসতে পেরেছে বলেই সুখী···সেই সুখটুকুই ওদের সারা জীবনের পাথেয়···কেন ওর ভুল ভেঙ্গে দিয়ে চিরদিনের জন্য ওকে দুঃখের ভাগী করবে। উমা তো সাধারণ মেয়ে নয়, উমা বলেছিল একদিন যে, ভাল বাসবার মত একজন পুরুষকেও পেলাম না খুঁজে··· সবাই করে স্তব স্তুতি, নারীর পায়ের তলায় সবাই মাথা লুটিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পুরুষের মত পুরুষ সে কই, যার পায়ের তলায় মেয়েরা স্বেচ্ছায় মাথা নত করে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দেবে। সেই উমা দেখলো তোমাকে, তোমার নির্ব্বিকার মন, আর ঔদাস্য ওকে মুগ্ধ করলো, তুমি যে ওকে এড়িয়ে চলছিলে, সেই টুকুতেই ও মন হারালো, এখন ওকে ফেরানো অসম্ভব··· ও তোমার পুজা করে, শুধু ভাল বাসে না···

সুদর্শন চেয়ার ছাড়িয়া অসহিষ্ণু ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।··· তাহার পর দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া সংশয় বিদ্ধ স্বরে কহিল কিন্তু আমি তো এ সব চাই না পরাশর, আমি এত সৌভাগ্য নিয়ে কি করবো···? আমি কাজের মানুষ. একজন এসেছিল আমার প্রথম যৌবনে, তাকেই যা কিছু সব নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি

আজ আর সে মনও নেই…সে উদ্যমও নেই, কেমন করে ওর স্বয়ম্বরের মালা অম্লান মুখে মাথা নীচু করে নেব, পরাশর!… এতখানি প্রবঞ্চনা আমি কেমন করে করবো।

পরাশর নত মুখে ভাবিতে লাগিল, সুদর্শনের সমস্ত কথাই সত্য… উমাকে সে যখন কিছুই দিতে পারিবে না, তখন মিথ্যা ভালবাসার বাহ্যিক অভিনয় দেখাইবার মত মহাপাপ আর নাই…পরাশর তাহা জানে, পরাশরের অন্তরে টুনুর স্মৃতি অমনিই অমলিন দীপ শিখাটীর মত জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে তাইতো পরাশর বিবাহে বিমুখ…

সুদর্শন খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বিদায় লইল। সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে পৃথিবী তখন ধীরে ধীরে মুখ লুকাইতেছে। ভৃত্য আসিয়া কক্ষে কক্ষে বোতাম টিপিয়া বাতি জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গেল, পরাশর সেইখানেই বসিয়া রহিল।

জীবনের ট্রাজেডি বুঝি ইহাকেই বলে, যেন ভিন্নমুখী কয়টা স্রোত প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে, পরাশর আর সুদর্শনে কতটুকু তফাৎ, পরাশর জীবন্ত স্মৃতির সম্মান করিতেছে, টুনুকে ভুলিতে পারে নাই, আর সুদর্শন মৃতার…

উভয়েরই ভাবধারা এক…শুধু ভিন্ন ভিন্ন মুখ..। টুনু আর উমাতে প্রভেদ কতটুকু? উমা নিজেকে সংযত করিতে জানে বিবিধ উপায়ে, আর টুনু উপায় না পাইয়া নিজেকে স্বামীর খেয়ালের পুতুল করিয়া রাখিয়াছে…

মনোবেদনা উভয়েরই অপরিবর্ত্তনীয়…প্রভেদহীন।…

আঠারো

শীলাও যে পথে গিয়াছে, সুব্রতও সেই একই পথের যাত্রী... পরাশর শুধু ভাবিয়া পায় না, যে মানুষে জন্মের ঋণ পরিশোধ করে কি এমনই করিয়া...একে একে সমস্ত সংসারটাই আলগা গাঁথুনীর বাড়ীর মত ধ্বসিয়া পড়িতেছে...পরাশরের কতটুকু ক্ষমতা, এই পতনের বেগ রুদ্ধ করে...

ধ্বংসের দেবতা জাগিয়াছেন, তাঁহাকে প্রশান্ত করিতে এমনই করিয়া জীবনাহুত দিতে হয়।

অর্থের অভাব, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, ঋণের জ্বালা, মানুষের দেহে আর কত সয়? সুব্রত পাষাণে গড়া পুত্তলিকা নহে, রক্ত মাংসে গড়া মানুষই, তিলে তিলে আপনাকে ক্ষয় করিতে লাগিল।

পরাশর রোজ আসিয়া যাহা প্রয়োজন দিয়া যায়, একটা নার্সও রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কাজল রাখিতে দেয় নাই; কাজল বলে, ঋণের বোঝা আর কত বাড়াবো পরাশর বাবু... আপনি যা করেছেন তা মানুষে করে না...

পরাশর হাসিমুখে বলিয়াছিল, বেশ তো তাহ'লে ধরে নাও, আমি তোমাদের দেবতা...

কাজল গভীর দৃষ্টিতে পরাশরের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগে

বলিয়াছিল, সত্যিই আপনি তাই…নইলে আমরা আপনার কে? কিন্তু এখানে আর আসবেন না পরাশর বাবু, আমি আপনাকে মানা কর্চ্ছি…

পরাশর সাশ্চর্য্যে কহিল, কেন এ কথা বলচো কাজল?

কাজল কহিল, এখানের বাতাস বিষাক্ত, পরাশর বাবু, আপনার মা আছেন এখনও বেঁচে…আপনি যা করেছেন যথেষ্ট, কিন্তু আর এখানে কোনদিন আসবেন না, আসতে দেব না আমি, আপনার পায়ে পড়ি…

কাজল ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল…পরাশর মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়া কহিল, কাজল আমার প্রাণটা এতই মূল্যবান! আর তোমার দিকটা তুমি একবারও ভেবে দেখচো না… প্রাণ তো সকলেরই সমান, বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা কি তোমারও নেই কাজল!

কাজল মাথা নীচু করিয়া রুদ্ধ গলায় কহিল, আমার প্রাণের চেয়ে আপনার প্রাণের মূল্য অনেক বেশী পরাশর বাবু বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা যদি বলি আমার খুব কমই আছে…পৃথিবীতে এসে পর্য্যন্ত ছেলে বয়সের কটা দিন ছাড়া সুখের মুখ দেখিনি…চিরদিন এই হাহাকার, আর দৈন্যতা দেখে আসছি, রোগের সঙ্গে শোকের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ কর্চ্ছি, পরাশর বাবু আরও বলেন—বাঁচবার সাধ…মেয়ে মানুষে আরও—এর পরেও বেঁচে থাকবার কামনা করে?

পরাশর এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর, কেউ

যদি ভালবেসে, স্বেচ্ছায় তোমাকে গ্রহণ করে কাজল, তখনও তুমি বলবে আমি বাঁচতে চাই না…

কাজলের চোখে মুখে ব্যাকুল প্রশ্ন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল; ভাষাহীন দৃষ্টি যুগল সে আরতি প্রদীপের মত পরাশরের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। পরাশর কোমল কণ্ঠে কহিল, কাজল, আমি তোমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিতে চাই, আমার শূন্য ঘরখানার ভার তুমি যদি নিজের হাতে তুলে নাও কাজল, তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই, আমিও আমাকে নিয়ে আর বইতে পাচ্ছি না।…

পরাশরের গভীর কণ্ঠস্বর কাজলের অন্তরের অন্তঃস্থলকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। কাজলকে পরাশর গ্রহণ করিতে চায়, পরাশর কাজলকে ভালবাসে! ইহাও কি সম্ভব! তাহার মত এক কুৎসিত রূপহীনা নারী…ওই কান্তিমান সুন্দর পুরুষ…

তাহারই পাশে নিজেকে কল্পনা করিয়া কাজলের অন্তর ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। পরাশর পাগল হইতে পারে, কিন্তু তাহার তো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে নাই…! কাজলকে পরাশরের আত্মীয় স্বজন বধূরূপে গ্রহণ করিবেই বা কেন? ..

কাজল মুখ তুলিয়া স্পষ্ট গলায় কহিল, আপনার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকেছে বোধ হয়, যান, আগে চিকিৎসা করানগে…কি ছেলেমানুষ আপনি বলুন তো…এত বাজে কথাও বলতে পারেন!

পরাশর মুখ তুলিয়া কহিল, ঠাট্টা নয় কাজল, কথাটা মানে,

আমি সিরিয়াস্‌লী-ই বলছি··· অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে—

কাজল রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তবে তাই! সত্যিই কোন বন্ধন আমার মন স্বীকার করে নিতে পারবে না···জানেন তো হাল আমলের মেয়ে-মন···তারা বিবাহের সুখ চায় না, চায় অপরিসীম স্বাধীনতা...

পরাশরের মুখ এক নিমেষে কালো হইয়া গেল। কাজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল, ওর চোখ ফাটিয়া অশ্রু আসিতেছিল; পরাশরকে লজ্জিত, অপমানিত করিয়া সেও কি তৃপ্তি পাইয়াছে...কাজল যে কত বড় স্বার্থত্যাগ করিল, এ কথা কি পরাশর জানে!

পরাশর শুধু জানিল, কাজলের মত মেয়েও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। বাড়ী ফিরিয়া পরাশর দেখিল ড্রয়িং রুমে নীরেশ বিজলী প্রভৃতি দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে। পরাশরকে দেখিয়া উহারা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরাশর ক্লান্তদেহে একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল।

নীরেশ টেবল হারমোনিয়ামটার চাবী টিপিয়া আস্তে আস্তে গান ধরিল;

আজি গন্ধ বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে···"

বিজলী কহিল, তোমার কর্কশ কণ্ঠস্বর থামাও বাপু, তার চেয়ে

আমার ব্যাঞ্জো চলুক···কিহে পরাশর অমন মচ্ছিভঙ্গ হ'য়ে পড়লে যে...

ও কিছুনা, একটা মানসিক অসুস্থতা...তোমার ব্যাঞ্জোই চলুক বিজলী, আমার বড় মিষ্টি লাগে...

পরাশর জোর করিয়া সোজা হইয়া বসিল। ইহারা কত সুখী, প্রফুল্ল, নিশ্চিন্ত মন···কেবল গান বাজনা, আর হাসি গল্প লইয়াই আছে···। নীরেশ একটা গৎ বাজাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া কহিল, পরাশর আসচে শনিবারে চুঁচড়োয় একটা সাহিত্য-সভা আছে, যাবে তো? তোমাকে কিছু বলতে হবে ভাই··· বুঝলে?

পরাশর পা দুইটা সুমুখের টেবিলে তুলিয়া দিয়া আলস্যভরে কহিল, ছেলে মানসী করেছি অনেক নীরেশ, আর ওসব ভাল লাগে না · মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে বলছ, কি বলবো; যে দেশের মানুষ আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করছে···চোখের সুমুখে স্ত্রী পুত্র মরে গেলেও অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পার্চ্ছে না··· সে দেশে সভা-সমিতি, জলসা আর নৃত্য অনুষ্ঠান নিয়ে মাতামাতি করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই ভাই। বলতে গেলে আমার মুখ দিয়ে হয়তো অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বেরিয়ে যাবে···। তোমাদেরও বলি, তোমরা যে সময়টা এই গান বাজনা আর সিনেমার আলোচনা নিয়ে কাটাচ্ছ, সেই সময় একটীবারও ভেবে দেখ কি...যে এই আনন্দের পিছনে বেদনার বন্যা ছুটে

আসছে···যে কোনও মুহূর্ত্তে এই আনন্দের আলোকমালা ভোজ-বাজীর মত মিলিয়ে যেতে পারে।

বিজলী ব্যাঞ্জোর স্বর মিলাইবার জন্য তারের উপর টুং টুং করে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল, পরাশরের প্রশ্নে মুখ না তুলিয়াই সে ঈষৎ উষ্ণ গলায় কহিল, কর্ম্মফলে যে যার দুঃখ ভোগ করবে, তাবলে আমাদেরও কি দুঃখবাদী দার্শনিকের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বল, পরাশর ?

না, তা বলব কেন বিজলী, যাদের সামর্থ্য আছে, তারা তো অনায়াসে দু' একটী অসহায় পরিবারের সাহায্য করতে পারে··· । যে পয়সায় হপ্তায় তিনদিন করে সিনেমা দেখা যায়, সেই পয়সাটা বাঁচিয়ে একটী পরিবারের সাতদিনের দু'বেলা আহার জুটতে পারে···। সাহায্য করতে গেলে এই রকম ভাবেই সাহায্য করা উচিত, নইলে চাঁদার মোটা মোটা খাতায় নাম সই করে দেশ-হিতৈষী সেজে কোন লাভ নেই ভাই···। আমি এমনি অনেক দুঃস্থ পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, তাই আমার প্রাণে এত আঘাত লাগে, আনন্দের সুরে সমানভাবে সুর মেলাতে গেলে গলা আমার কেঁপে যায়···

বিজলী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, তোমার কিছু হয়েছে পরাশর, নইলে এত বেশী বকচো কেন ? এক ঈশ্বর ছাড়া কেউ কারুর দুঃখ ঘোচাতে পারে না, তুমিই কি পার্চ্ছ...সুব্রত'র জন্যে যে এত প্রাণপণ করলে, তবু কি ওদের জীবন দিয়ে সুখী করতে পারলে ?

পারলে সুব্রত'র সংসারে হারাণো আনন্দের সুরটিকে ফিরিয়ে আনতে? ওসব কথার কথা, কেউ কারুর বেদনা ঘোচাতে পারে না…। তাই বলে আমরা আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবো কেন…? আমাদের জীবন এই রকম খুসীর স্রোতে উজান বেয়ে চলুক…

নীরেশ মাথা নাড়িয়া কহিল, নিশ্চয়! আমরা আনন্দ চাই, আমরা বাঁচতে চাই…আনন্দ না করে বাঁচবার পথ কেউ খুঁজে পায় না, রবি ঠাকুরের মত আমরাও বলতে চাই,—

"আপদ আছে, আছে জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে"

হুরে—বিজলীর ব্যাঞ্জো ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। কোমল মধুর অথচ তীব্র সে সুর, ঝঙ্কারে দিক্ দিগন্ত ভরিয়া উঠিল। যেন সুরের ঝড় বহিতেছে…

পরাশর চক্ষু মুদিল, ওর নিমীলিত চোখের পাতায় উমা কাজল ও কেতকীর বিভিন্ন রূপ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়…

পরাশর কিন্তু কাহারও নাগাল পায় না।…

উনিশ

আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়া পরাশর অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল; পত্রখানি রাধু লিখিয়াছে। গোপাল সেনের ছোট ছেলে বিনুর হাতের লেখা। রাধু জানাইয়াছে, কাজলদহের সেই হানার পুলটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে…আবার বর্ষা আসিতেছে…পরাশর যদি দয়া না করে, তাহা হইলে এইবার গ্রামশুদ্ধ লোক স্ত্রী-পুত্র গরু বাছুর-সহ জলের তলায় আশ্রয় লইবে!

পরাশরের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল এই আহ্বানে…রাধু তাহাকে পত্র দিয়া ভালই করিয়াছে, নহিলে সে ইহার প্রতিকার করিত কি করিয়া? যাইবার আগে সুব্রতকে দেখিয়া কাজলকে একবার বলিয়া যাওয়া উচিত; নহিলে কাজল কি ভাবিবে?

প্রথমে সে গাড়ী লইয়া দমদমায় ছুটিল, সুদর্শনের সাহায্য চাই, সুদর্শন না দাঁড়াইলে সে একা কোন রকমেই পারিয়া উঠিবে না—'হানা'র পুলটী সংস্কার করিতে লোকবল এবং অর্থবল দুই-ই চাই।

দমদমায় গিয়া সে সুদর্শনের একটী নূতন প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিল, সেখানে একটি 'নারী শিক্ষা মন্দির' উদ্বোধন করা হইয়াছে, সে প্রতিষ্ঠানের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী উমা…উমা স্বয়ং স্বেচ্ছায় এতখানি দায়িত্বের পদ গ্রহণ করিয়াছে…

উমার কষ্টক্লান্ত দেহ ও প্রসন্ন মুখ দেখিয়া পরাশর নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল: পৃথিবীতে যাহারা না চাহিতেই সব পায়, তাহারা কেন ইচ্ছা করিয়া দুঃখ ভোগ করে? ওই সুদর্শন আজ বৃথা শুষ্ক নীরস আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে···নহিলে উমার মত মেয়ের নিঃস্বার্থ প্রেম ··

সুদর্শনের এই স্বেচ্ছাকৃত আত্ম নির্য্যাতনের কোন মূল্যই নাই · আর উমা, খেয়ালী উমাও যেন জোর করিয়া তপশ্চর্য্যায় নামিয়াছে···

হয়তো ইহা উমার প্রেম নহে···শুধু অপরিসীম শ্রদ্ধা, · কে জানে মেয়েদের মন, কেহ বুঝিতে পারে না!···

পরাশর ও সুদর্শন একদিন বিকালের ট্রেনে ক্ষীরপুর অভিমুখে যাত্রা করিল...আসিবার আগের দিন সন্ধ্যায় পরাশর সুব্রতকে দেখিতে গিয়াছিল···সুব্রতর অবস্থা ধীরে ধীরে শীলার মতই হইয়া আসিতেছে। 'পতি পরায়ণা' স্ত্রীর নাম পরাশর অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু এমন পত্নী-গত-প্রাণা পুরুষ সে কোথাও দেখে নাই···সুব্রত যেন প্রিয়তমার সহিত মিলনের আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন গুণিতেছে। কঙ্কালের মত অস্থিসার দেহ ওর শয্যালীন হইয়া পড়িয়াছে।

এক মিনিট শয্যাপার্শ্বে বসিতে দিয়াই কাজল বাহির হইতে পরাশরকে ডাকিল; শুনুন...

পরাশর নীরবে উঠিয়া আসিয়া কহিল, কি বলছ কাজল?

আপনার দেখা হয়েছে তো? এবার বাড়ী যান, বাড়ী গিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে সাবান মেখে স্নান করে ফেলবেন··· বুঝলেন, এ ঘরে রোগের জার্ম হয়তো ছড়ানো রয়েছে।

কাজলের চোখের উপর চোখ রাখিয়া পরাশর কহিল, এত নিষ্ঠুর তুমি কেন কাজল? তোমার স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার হওয়া উচিত ছিল। সব করবো আমি···কেন করবো··? কিসের জন্যে এই প্রাণটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবো কাজল...? কে আমার মুখ চাইবার আছে...আমার মৃত্যুতে আমার মা ছাড়া কে চোখের জল ফেলবে···? না আমি তোমার কোন কথা শুনবো না...এখনও বলছি কাজল, আমার কথা রাখো, আমি তোমায় মিনতি কর্চ্ছি, তোমার জীবনটাকে আমার হাতে তুলে দাও···তোমাকে আমার বলে ভাবতে দাও কাজল—?

নিশ্বাস রোধ করিয়া কাজল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, এখন যে কাজে যাচ্ছেন, যান্ তো...আমি এখুনিই মরছি না···আমাকে আপন করে নেবার সময় এর পরে অনেক পাবেন পরাশর বাবু... কিন্তু বাঁধ ভাঙ্‌লে হাজার হাজার প্রাণীর মৃত্যু রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে...তখন আপ্‌শোষ করাই সার হবে।

পরাশর গাঢ়স্বরে কহিল, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস নেই কাজল, তুমি এই বলে বার বার আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ···তোমার কি একটুও দয়া নেই, কাজল?

কাজলের ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল···কি বলিবে

সে, পরাশরের উদ্ধত প্রেম সে যে কেন বার বার ফিরাইয়া দিতেছে ...পরাশরকে তাহা কি করিয়া জানাইবে? কেনই বা পরাশর তাহার কাছে এমন অসম্ভব প্রার্থনা করে!

*　　　*　　　*　　　*

কাজলদহের অশান্ত জল যেন কূলে কূলে উপছাইয়া পড়িতেছে, বাঁধের অবস্থা শোচনীয়...লোকেরা প্রাণ হাতে করিয়া পারাপার করিতেছে...পরাশর ও সুদর্শনের অক্লান্ত চেষ্টায় নূতন পুল তৈয়ারি হইল, 'ডষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহায়তায় নূতন পাকা রাস্তাও তৈয়ারী হইতে লাগিল···পরাশর এইবার তাহার বসত বাটীর সংস্কারে মন দিল...

কাজলকে আনিয়া সে এই সাতপুরুষের ভিটায় তুলিবে··· কাজলের নিপুণ হাতের স্পর্শে সমস্ত বাড়ীখানি ঝলমল করিবে ...পরাশরের অনন্ত আশা···টুনুর স্মৃতি তার অন্তরাকাশ ছাইয়া থাকুক···তাই বলিয়া মরণের মুখে কাজলকে সঁপিয়া দেওয়া যায় না··

আর উমা, উমা সুদর্শনের আশায় এ জন্ম শুধু প্রতীক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিক···উমাতো পরাশরের মর্ম্ম বেদনা বুঝিয়াও বুঝে নাই।

পুরাণো বাড়ীর গায়ে রঙ ফিরানো হয়···ঘরের মেঝে নূতন করিয়া সাদা ও কালো মার্ব্বেল দিয়া তৈয়ারী হয়···হল ঘরের ভিতর মেঝেতে আঁকা হয় এক জোড়া হংস মিথুন···পঙ্খের কাজ করা বারান্দা সূর্য্যালোকে ঝকঝক করে, ত্রিতলের দক্ষিণের বারান্দায়

জালিকাটা পাথরের জাফরী বসে···এইখানে দাঁড়াইয়া কাজল কাজলদহের জল দেখিবে...

তাল সুপারী ও নারিকেল গাছের ঘন পত্রাবরণ ভেদ করিয়া চাঁদের আলো আসিয়া কাজলের মুখে পড়িবে, সৌভাগ্যবতী কাজল...

অন্তরে টুনু, আর বাহিরে কাজল···পরাশর রাত্রে আর ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে না...রাধুর দোকানে গিয়া কীর্ত্তন শোনাও হয় না...। কেবল প্রতি মুহূর্ত্তের পদধ্বনি গোণে···ভাবে আর কয়টা দিন...আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করিয়াই সে তাহার গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে আনিবে...

*　　　*　　　*　　　*

কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফ পাইয়া পরাশর সুদর্শনকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। মা, বাবা, সকলেই সুস্থ রহিয়াছেন...তবে!

পরাশরকে দেখিয়া মা বিষন্ন মুখে কহিলেন, সুব্রতর সব শেষ হয়ে গেল প্রিয়, এবার কাজলের পালা...কাজল তোকে ডেকেছে...

পরাশরের বুকের ভিতর কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে ছুরী চালাইয়া দিল। সুব্রত পলাইয়াছে···সুব্রত মিলিত হইয়াছে তাহার প্রিয়ার সহিত, কিন্তু মা কেন বলিলেন. এবার কাজলের পালা! কাজল কি তবে —

পরাশর আর অপেক্ষা করিল না, জামা কাপড় ছাড়িবার

বসর পর্য্যন্ত তাহার নাই…কাজলের আহ্বানে সে উন্মাদের মত ছুটিল…

শয্যালীনা কাজল, একটী অপরিচিতা মেয়ে, সম্ভবতঃ নার্শই, পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া কাজলকে সঞ্চয়িতা হইতে কবিতা পড়িয়া শোনাইতেছে।

পরাশরকে দেখিয়া কাজলের কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া চেয়ার দেখাইয়া সে ক্ষীণস্বরে কহিল বোসো…

পরাশর কাজলের মুখে এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন শুনিল। মন্ত্র মুগ্ধের মত সে চেয়ারে না বসিয়া কাজলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ওর ললাটে হাত রাখিয়া সজল কণ্ঠে কহিল, কেন আগে জানাওনি কাজল? কেন এমন রোগ গোপন করলে?

কাজল হাসিল, বড় করুণ সে হাসি…মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, এ রোগ তো তুমি আমার সারাতে পারতে না; আমাদের এই বংশটাই এমনিতর অভিশপ্ত হয়ে গেছে…। এর পরে জেনে শুনে কেমন করে আমি তোমার কথায় সম্মতি দেই! তুমি আমাকে ভাবলে কাজলও নিষ্ঠুর, কাজল হৃদয়হীনা…কিন্তু আমি —আমি হৃদয়হীনা নই…আমি তোমাকে—

কাজলের চোখের দুই পাশ দিয়া দর দর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।…

এই কালো কুৎসিত দেহটাকে তুমি ভাল বেসেছিলে, আমার

মত মেয়েকেও তুমি আদর করে গ্রহণ করতে চেয়েছিলে ...কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ, এত সৌভাগ্য সইল না, দু'হাত ভরে নিয়েই গেলুম, তোমাকে আমি কিছুই দিয়ে যেতে পারলুম না...

পরাশরের চক্ষু দেখিতে দেখিতে অশ্রু সজল হইয়া উঠিল। কাজলের কপালে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে রুদ্ধস্বরে কহিল, যা দিলে কাজল, এই আমার যথেষ্ট...এর বেশী আমি আর কিছু চাই না...

কাজল আরও মৃদুস্বরে কহিল, আমার যা বলবার ছিল বলেছি...তুমি আমার এত কাছে থেক না...ওই চেয়ারটাতে বসো...জানো না, আমার নিশ্বাসে পোকা বেড়াচ্ছে...

পরাশর কাজলের হাতখানি দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে কহিল, বেড়াক পোকা...। কাজল, এই জন্যেই অনেক আগে তোমাকে চেয়েছিলুম...কিন্তু তখন তুমি শুনলে না, এখন তোমাকে ফেরাবো কি করে কাজল, এত অল্প সময়ে তুমি যে আমাকে আশ্বাস দিয়ে পালিয়ে যাবে—তা তো জানতাম না...জানলে কখনোই তোমাকে মরতে দিতাম না...

পরাশরের চোখের কোলে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল। কাজল মুগ্ধ চোখে পরাশরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।...

কুড়ি

কাজলও চলিয়া গেল !

পরাশরের আর রহিল কি, শুধু বেদনার স্তূপ ··আর স্মৃতির কঙ্কাল...একলা ঘরে অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া পরাশর আর কতদিন কাটাইবে ! পরাশরের অবস্থা দেখিয়া পিতা বলিলেন, এবারে ও যেখানে ইচ্ছা যায়, বিবাহ করিবে, উহাকে আর বাধা দিব না... মার মন শঙ্কায়, বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পরাশর আর ভাল করিয়া কথাও বলে না...

ওর শুধু মনে হয়, কাজল বড় দুঃখেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। সুব্রতর সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই যদি সে কাজলকে গ্রহণ করিত...! কাজল গিয়াছে তাহাকে অপরাধী করিয়া...কাজলকে এত করিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারিল না।...

* * * *

কটক হইতে মা কাল রায় মহাশয়ের পত্র পাইয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে কেতকী তাহাকে একটী পুত্র সন্তান উপহার দিয়া চতুর্দ্দশীর রাত্রে কটকের হাঁসপাতালেই প্রাণ দিয়াছে ; ছেলেটী ভূমিষ্ঠ হইয়া মাত্র দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, নবজাত শিশুটী দেখিতে না-কি অবিকল পরাশরের মতই হইয়াছিল ···!

পত্রখানি হাতে লইয়া পরাশর কতক্ষণ ছাদের উপর পায়চারী করিল···উর্দ্ধে নীলাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, ছোট বড় অনুজ্জ্বল এবং কোনটায় হীরকের দীপ্তি···

কাজল আর টুনু উহারই ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে...

শেষ পর্য্যন্ত টুনু তাহাকে ভোলে নাই··

ওর শিশুর মুখের ছাঁচ···অঙ্গের গঠন···দেহের সৌকুমার্য্য··· সবই পরাশরের মত···অবিকল, নিখুঁত···রায় মহাশয় হয়তো কি ভাবিয়াছেন কে জানে···কিন্তু ইহা যে ঐকান্তিক মনন শক্তির ফল, তাহা পরাশর জানে···কেতকীর একাগ্র চিন্তা দেহাভ্যন্তরে গিয়া ওই জড় মাংসস্তূপকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিল !···

গড়িয়া তুলিল একটী জীবন্ত মানবকে···

কিন্তু...

... ...

অন্ধকার বারান্দায় নরম সোফার উপর পরাশর চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল···সহসা তাহার কপালে গরম জলের ফোঁটার মত টপ্ টপ করিয়া কি যেন পড়িল ! হাত বাড়াইতেই কে যেন তার পায়ের কাছে নদীর স্রোতের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল !

বিস্মিত পরাশর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কে ?

—আমি উমা।

উমার রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে পরাশর চমকাইয়া উঠিল, হাতের

উপর কাহার কোমলতম স্পর্শ...উমা তাহার সান্নিধ্যে ঘনিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরাশর ক্লান্ত গলায় কহিল, আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছ উমা! কিন্তু—

উমা কম্পিত গলায় কহিল, না তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিনি, এসেছি ক্ষমা চাইতে···আমার সমস্ত অপরাধ তুমি ক্ষমা করো···

পরাশর অন্ধকারে উমার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইল না, কিন্তু অনুভব করিল উমার পদ্ম পলাশের মত দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে...

উমা সিক্ত গলায় কহিল, ভুল করেই ভুল পথে চলেছিলুম, ফিরিয়ে আনলেন সুদর্শন বাবু, ওর মুখেই শুনলাম তোমার সব কথা আর—

পরাশর বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু সুদর্শন! কুসুমপুরের জমীদারের পোষ্যপুত্র···

উমা আস্তে আস্তে কহিল, সুদর্শন বাবু আমার বৈমাত্রেয় ভাই···মার মুখে শুনলাম! আমার অপরাধের সীমা নেই...হয়তো তুমি আমাকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করতে পারবে না কিন্তু আমি এ অপরাধের বোঝা তোমার পায়ের তলায় না নামিয়ে কেমন করে থাকবো···? বিশ্বাস করো আমায়, পরাশর

আমি সে রকম কোন অপরাধ আজও করিনি যাতে···যাতে তোমার স্নেহ হারাতে পারি আমি—

উমা মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। ওর কণ্ঠ কান্নায় বুজিয়া গেল।...

অন্ধকারেই পরাশর উমার দক্ষিণ হাতখানি সযত্নে তুলিয়া ধরিল।

না, উমা তাহার পাশে আসিয়া না দাঁড়াইলে পরাশরের দীর্ঘজীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে

... ...

জীবনের অফুরন্ত পথ...

সে পথে পরাশর একা-একা চলিতে পারিবে না।

উমার মত একটী সঙ্গিনীই তাহার কামনীয়···!

কাজল, আর টুনু···

উহারা কি পরাশরকে ক্ষমা করিবে না? ··

সম্পূর্ণ